সম্পাদকীয়

প্রতিবছর নিয়ম করে অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস আসে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে জাঁকজমকভাবে দিবসটি পালন করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রিয় শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করে। এ বছরের মতো ব্যতিক্রম শিক্ষক দিবস সম্ভবত ছাত্রশিক্ষক কেউ কোনদিন দেখেনি। ছাত্র আছে, শিক্ষক আছেন, বইখাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে কিন্তু এক জায়গায় নেই। পড়াশোনা, ক্লাস সবই চলছে তবুও সব স্থবির!

করোনা শুধু নিয়ে যায়নি, অনেক কিছু দিয়েও গেছে। এই অনির্ধারিত অনিশ্চিত করোনাকালেই হাড়ে হাড়ে আমরা বুঝতে পারলাম ছাত্রদের কোলাহল আমরা কতো ভালোবাসতাম। ছাত্ররা বুঝতে পেরেছে শিক্ষকদের কঠিন ক্লাসগুলোতেও কতো আনন্দ ছিল। সবাই মুখিয়ে আছে-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কবে খুলবে! কবে আবার আগের মতো ক্লাস হবে।

এই ম্যাগাজিনটি শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার ভালোবাসা, সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মনে হয়েছে আমার ছাত্র-ছাত্রীরাই পৃথিবীর সেরা ছাত্র-ছাত্রী, আমার সহকর্মীরাই পৃথিবীর সেরা সহকর্মী।

যেকোন কিছুই যখন প্রথমবার আয়োজন করা হয়, সেটা হয় আসলে একটা টিমওয়ার্ক, একক কৃতিত্ব কারো থাকেনা। তারপরেও ‘অপ্রতিরোধ্য’ প্রকাশের ব্যপারে আমার পক্ষ থেকে একক কৃতিত্ব দিতে চাই রাশিদা স্বরলিপিকে। তিনি কতো ভালো কাজ করেছেন, তা অন্যেরা বলবে কিন্তু তিনি তার সবটুকু দিয়েছেন, সেখানে কোন খাদ ছিলনা।

আমাদের উপাচার্য মহোদয় এবং রেজিস্ট্রার স্যার এর কথা আলাদা করে বলার কি প্রয়োজন আছে! আসলে সব উদ্যোগ তো তাঁদের নেয়া। আমরা সেই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্যে নূন্যতম শ্রম দিয়ে থাকি। সবশেষে এটাই বলবো, ম্যাগাজিনের প্রতি পাতায় ইইউবি পরিবারের অনেক সদস্যের স্পর্শ আছে, যারা ধন্যবাদের তোয়াক্কা না করেই যথেষ্ট ব্যস্ততার মাঝেও কাজটি তুলে আনতে সাহায্য করেছেন। বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের কলেজগুলোর শিক্ষকবন্ধুদের, যাদের লেখা আমাদের কাছে আশির্বাদস্বরূপ। সবশেষে আমি আবার সেই প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের কথাই বলবো, আমি নিশ্চিত-আমাদের অপ্রতিরোধ্যরা আমাদের এই প্রথম প্রকাশকে একদিন আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাবে। সবার প্রতি শুভকামনা, শ্রদ্ধা।

.....

ড. ফারজানা আলম

সম্পাদনা পরিষদ

ড. প্রফেসর মকবুল আহমেদ খান
উপাচার্য, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

আ.ফ.ম গোলাম হোসেন
রেজিস্ট্রার, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

ড. কাজী বজলুর রহমান,
প্রোক্টর, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

সম্পাদক : ড. ফারজানা আলম
সহযোগী সম্পাদক: রাশিদা স্বরলিপি

সহকারি সম্পাদকঃ

মো. মমিনুল ইসলাম
মুশফিকা বিনতে কামাল
মো. এজাজুর রহমান
তারসিয়া আলম

কম্পোজ

আলীমা
সোহান

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স

ইমরান নাজির

(ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনের একটি উদ্যোগ)

ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (দেশীয় পরিবেশে ইউরোপিয় মানের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়)

['ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১৪ মার্চ। ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এবং প্রফেসর ড. মকবুল আহমেদ খান বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের একটি অনন্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য হলো আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা।]

বিগত সাত বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি এতোটাই আশাব্যাঞ্জক যে আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয়টি উপমহাদেশের সর্ববৃহৎশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ব্যাপারে আশাবাদী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ইতোমধ্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ৭ বছর অতিক্রম করেছে। ই.ইউ.বি তিনটি ফ্যাকাল্টির আওতায় বর্তমানে ১০ টি বিভাগ রয়েছে;

যথাক্রমেঃ
১।ব্যবসায় প্রশাসন, ২। ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, ৩। অর্থনীতি, ৪। ইংরেজি, ৫। আইন, ৬। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ৭। ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ৮। কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ৯। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ১০। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আই.পি.ই)।

ইইউবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মকবুল আহমেদ খান একজন শিক্ষানুরাগী, দেশে ও বিদেশে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অনন্য অবদান রয়েছে। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যিনি ১৯৭১ সালে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলাকে শত্রুমুক্ত করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ই.ইউ.বি বর্তমানে এ পর্যায়ে এসেছে।
ইইউবির প্রাতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, এম. পি. একজন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী। তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতার মাধ্যমে। তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সচিব এবং পরবর্তীতে রাজনীতিতে প্রবেশ করে দুই টার্মে যথাক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।
আর্থিক সক্ষমতার সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য যেন কেউ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য তুলনামূলক অতি অল্প খরচে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। ইইউবিতে বর্তমান বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে, মোট শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৪০০।

এখানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ছাত্রীদের কাছ থেকে আরো অনেক কম ফি নেয়া হয় ।
উচ্চমানের প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য: Vision

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা বিস্তারে সক্ষম একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করা ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য।

অভীষ্ট লক্ষ্য: Mission

বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থীদেরকে বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। নতুন প্রজন্মের জন্যে যুগের চাহিদা অনুযায়ী গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:

মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে মাসিক টিউশন ফি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নির্ধারণের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাকে তাদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে এনে দেওয়া।

- দেশের শতকরা ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী পল্লী অঞ্চলের স্কুল কলেজে পড়াশুনা করে অথচ দেশের সর্বমোট জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের অংশ মাত্র ১০%। ফলশ্রুতিতে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগই পায় না। তাছাড়া অতি উচ্চ টিউশন ফিতে দেশের অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া অসম্ভব কল্পনা মাত্র। ঐ সমস্ত পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আধুনিক উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে দিয়ে তাদের মেধা বিকাশে ইইউবি অঙ্গীকারবদ্ধ।
- দেশ বিদেশে মানব সম্পদের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- পাঠদান কার্যক্রমকে নিয়মিত মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষকবৃন্দকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইভাল্যুয়েশন সেকশনের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়নের জন্য বছরে কমপক্ষে একবার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- প্রতি ৪ মাসে একটি সেমিষ্টার ।প্রতি সেমিষ্টারে প্রতি বিষয়ে মোট ১০০ নম্বরে ৬ টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, যার নম্বরের বিভাজন: মিডটার্ম-৩০%, ফাইনাল টার্ম-৩০%, মিড-টার্মেরপূর্বে ২টি ক্লাসটেস্ট-২০% এবং ফাইনাল-টার্মের পূর্বে ২টি ক্লাসটেস্ট-২০%।
- এই নিবিড় পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সারাবছর লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকে, এতে করে তাদের মাথায় কোন খারাপ চিন্তা ঢোকার কোন অবকাশ পায়না।
- ইইউবি একটি নকলমুক্ত পরীক্ষা অঙ্গন। নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কতিপয় নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে পরীক্ষা পদ্ধতিকে ১০০% নকলমুক্ত করা হয়েছে।
- মডিউলার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ই.ইউ.বি এর একটি ইউনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি। বিশ্বখ্যাত ও জনপ্রিয় সকল বইপত্র ঘেটে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করে আমাদের দেশীয় শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে এইসব মডিউল তৈরি করা হয়েছে যা থেকে শিক্ষার্থীরা খুব কম সময়ে আধুনিক ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

- লেখা-পড়ার পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলার কার্যাবলী যেমন- ইনডোর গেমস, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সহ নানা ধরণের খেলাধুলা, ডিবেট, ম্যাথ অলিম্পিয়াড, সাহিত্য প্রতিযোগিতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হয়ে থাকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিধারী পূর্ণকালীন চার শতাধিক শিক্ষকমন্ডলী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল চালিকাশক্তি। সারা বছর নানামুখী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।
- ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা গাবতলীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই স্থায়ী ক্যাম্পাস।

বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী, শিক্ষকমন্ডলীর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাসরুম, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরী, সুপরিসর লাইব্রেরী ইত্যাদি। ইউজিসির এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের জন্য মাথাপিছু ব্যয়ের ক্ষেত্রে সারাদেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের স্থায়ী ক্যাম্পাসে রয়েছে ১৪তলা বিশিষ্ট নিজেস্ব ভবন। এটির আয়তন সাড়ে পাঁচ লক্ষ বর্গ ফুট। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আরও সম্প্রসারণ ও এর নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

- ৩৬,০০০ বর্গ ফুট এলাকা জুড়ে রয়েছে সুপ্রসস্ত অডিটরিয়াম।
- উঠানামার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে রয়েছে এসকেলেটর, ৬ টি লিফট ও সিঁড়ি।
- প্রতিটি ফ্লোরে ইনডোর গেমস ও কমনরুমের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা।
- গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে ২ টি বেজমেন্ট।

শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা:

- পড়ালেখার পাশাপাশি চাকরির সুযোগ
- ডিপ্লোমাধারীদের ইভিনিং ব্যাচে পড়ালেখার সুযোগ।
- গ্রুপ স্টুডেন্টদের জন্য (কমপক্ষে ১০জন) টিউশন ফি-তে ছাড় রয়েছে। ছাত্রদের জন্য ৪০% এবং ছাত্রীদের জন্য ৫০% পর্যন্ত টিউশন ফি ছাড় দেওয়া হয়।
- ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাস গাবতলীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় সার্বক্ষণিক যাতায়াত-এর সুবিধা রয়েছে।
- এখানে রয়েছে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ।

শুধুমাত্র আর্থিক কারণে শিক্ষার্থীরা যেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত না হয়-সেজন্য ইইউবিতে আর্থিক বিবেচনায় কম খরচে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে ইইউবি প্রতিষ্ঠিত

আ.ফ.ম. গোলাম হোসেন, রেজিস্ট্রার, ইইউবিঃ

সুবিধাবঞ্চিত শ্রেনির উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত। সেই উদ্দেশ্য সাধনে বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন পর্যন্ত অনেক সাফল্য দেখিয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা প্রদান বিশেষ করে উচ্চ আর্থিক ব্যয়ের কারণে যাদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তাদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পেরেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করে নকলমুক্ত পরিবেশে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসনিক-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা পায়, ছেলে মেয়েরা যাতে লক্ষ্য অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে সচেতন ভূমিকা পালন করছে এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অবস্থানগত কারণেও এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অগ্রগামী। রাজধানীর পশ্চিম গেটওয়ে খ্যাত গাবতলীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেস্ব ক্যাম্পাস। অবস্থানগত কারণে দেশের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের জন্য সহজতর যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের এক্সট্রা কারিক্যুলার একটিভিটিস সম্প্রসারণের জন্যও বিভিন্ন ও বহুমুখী কর্মসূচি চালু রয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় সম্প্রতি

ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর শিক্ষার্থীরা ইন্দো বাংলা টি ২০-তে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

ভবিষৎ প্রজন্মকে সব কিছু বিবেচনা করে দক্ষ নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর শিক্ষাকার্যক্রমে ভর্তি হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

কলেজ শিক্ষকদের শিক্ষাভাবনা)

[উচ্চশিক্ষা গ্রহণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর আগেই ঝরে পড়ে অনেক শিক্ষার্থী। কেউ ঝরে যায় মাঝ পথে। তাদের ঝরে পড়ার কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খোঁজার উদ্যোগ নিয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, ও সহকারি অধ্যাপকেদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে এই আয়োজন।]

'আর্থিক অসচ্ছলতা শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ'

মো. আজাদুর রহমান চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, জিরাবো দেওয়ান ইদ্রিস কলেজ।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই চিত্র আলাদা। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে শিক্ষার্থীর পরিবারকে মোটা অংকের টাকা জোগান দিতে হয়। অনেক পরিবারের এই সামর্থ্য থাকে না। সেসব পরিবারের সন্তানেরা অনেকেই উচ্চশিক্ষার স্তরে প্রবেশের আগেই ঝরে পড়ে।- **বলছিলেন মো. আজাদুর রহমান চৌধুরী।**

তিনি আরও কিছু কারণ উল্লেখ করেন যা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর জন্য বাঁধা।
পারিবারিক অস্বচ্ছলতা শিক্ষার্থীকে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণের মুখোমুখী করে দেয়। এ সময় অনেকে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে শুধু কাজে যোগ দেয়। এরপর অনেকেই পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক বা নিজের ইচ্ছাতেই উচ্চশিক্ষার গণ্ডি না পেরিয়েই বিয়ে করে।

এই সমস্যা সমাধানে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যুগোপোযুগী এবং কর্মসংস্থান বান্ধব বিষয়েপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে যাতে, পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আবার উচ্চ স্তরের পড়ার বিষয় কেবল মাত্র থিয়োরিটিক্যাল না থেকে যথা সম্ভব প্র্যাকটিক্যাল হওয়া উচিত। এতে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে ক্রমে দক্ষ করে গড়েতুলতে পারে।

[আধুনিক যুগে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে যেসব মাধ্যমে আয় করতে পারে সে সব মাধ্যম সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করতে হবে। আয়ের সঠিক পথ দেখাতে হবে। তারা যেন নিজেকে এই প্রতিযোগিতার বাজারে এগিয়ে রাখতে পারে- সেভাবে পৃষ্টপোষকতা দিতে হবে।]

এই পৃষ্ঠ পোষকতা আসতে হবে, পরিবার, রাষ্ট্র এবং উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে।

‘পড়ার বিষয় এবং চাকরির ক্ষেত্র সামঞ্জস্যহীন’

মো: মহিউদ্দিন, অধ্যক্ষ সাভার ট্রাস্ট কলেজ

প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে চাকরিদাতাদের পছন্দ প্রাধান্য পায় অন্যদিকে চাকরি প্রার্থীদের প্রথম টার্গেট থাকে একটি চাকরি পাওয়া। অনেক সময় দেখা যায়, জানা বিষয় আর কাজের সুযোগ পাওয়া ক্ষেত্রটির মধ্যে বিস্তর ফাঁরাক। এই অবস্থায় অর্জিত শিক্ষার অধিকাংশ অব্যবহৃত ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। এই উদাহরণ সমাজে কম নেই, ফলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি পর্যায়ে থাকা শিক্ষার্থীরা আশাহত হয়। - বলছিলেন, মো: মহিউদ্দিন, অধ্যক্ষ সাভার ট্রাস্ট কলেজ।

তিনি আরও বলছিলেন সমস্যা এবং সমাধান পাশাপাশিই থাকে, সমস্যা অনুযায়ী সমাধানের পথও খুঁজে নিতে হবে।

মো: মহিউদ্দিন বলেন- অনেকে নিজের আগ্রহের বিষয়ে পড়তে না পেরে মাঝপথে পড়া থামিয়ে দেয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে এসে বিয়ের চাপ সৃষ্টি হয়- পরিবার ও সমাজ অনেক ক্ষেত্রে অসহযোগী আচরণ করে। আবার বাড়ি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ার কারণে অনেক মেয়েকে পড়া থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

অন্যদিকে রাস্তা-ঘাটে নিরাপত্তাহীনতা বিষয়টি নিয়েও অভিভাবকরা অনেক সময় অধিক চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং মেয়েকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেন। গোটা সমাজের চিত্র যতোবেশি ইতিবাচক হবে এই কারণটি ততোবেশি অকেজো হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে সচেতনতা প্রয়োজন- পরিবার থেকে প্রশাসন, অভিভাবক থেকে শিক্ষক পর্যন্ত। একই সঙ্গে একজন মেয়েকেও হতে হবে অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য।

চাকরি দেয়া এবং নেয়ার ক্ষেত্রে অসৎ প্রথা চালু আছে তা দূর করা না গেলে শিক্ষার্থীদের কাছে চাকরি প্রধান হয়ে উঠবে-জ্ঞান অর্জন তাদের লক্ষ্য হবে না। সেক্ষেত্রে ‘মানুষ হতে হবে’ এই ধারণা থেকে তারা ধীরে ধীরে দূরে চলে যাবে, মেধাবী শিক্ষার্থীরা হতাশ হবে। যে কোন উপায়ে অসৎ প্রথা বন্ধ হতে হবে।

মাদকের হাত থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করা না গেলে তারা স্বাভাবিক জীবন থেকে সরে যাবে, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাদকের ছায়া ব্যপক নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

যুগোপযোগী বিষয়ের অভাব’

মো. ইউনুছ আল মামুন

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ হিসেবে ***তেঁতুলঝোড়া কলেজের অধ্যক্ষ মো. ইউনুছ আল মামুন বলেন-***

প্রথম কারণ লেখাপড়ার খরচ চালাতে অপারগতা। পর্যায়ক্রমে আরও যেসব কারণে শিক্ষার্থীরা ঝরে যায় তা হলো- প্রস্তুতির অভাব, লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যর্থতা, বিষয় নির্বাচনে ভুল। এছাড়া রয়েছে প্রতিষ্ঠানের অবহেলা, সেশনজট, বিষয়ের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের যোগসূত্র খুঁজে না পাওয়া এবং যুগোপযোগী বিষয়ের অভাব।

শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধে মো. ইউনুস আল মামুনের পরামর্শ হলো- উচ্চশিক্ষার বিষয় নির্ধারণে শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই সচেতন হতে হবে। তাকে জানতে হবে বিষয়ভিত্তিক কোন কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। *(যেহেতু সমাজে প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা এক নয়, অনেক শিক্ষার্থী আর্থিক যোগানের অভাব চিন্তা করে হতাশ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেয়া বা কর্ম করার পাশাপাশি যেন পড়তে পারে সেই উদ্যোগ নিতে হবে।)* তাদের টিউশন ফি বিশেষ বিবেচনায় কমানোরও পরামর্শ দেন ইউনুস আল মামুন।

অনেক সময় শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়তে পারে না বা যে বিষয়ে তার দক্ষতা কম এমন একটি বিষয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে যায়। এই অবস্থায় একজন শিক্ষার্থী লক্ষ্যচ্যুত হতে পারে বলে উল্লেখ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে প্রতিষ্ঠানকে প্রধান গুরুত্ব না দিয়ে বিষয়কে প্রধান গুরুত্ব দেয়ারও পরামর্শ দেন তেঁতুলঝোড়া কলেজের এই অধ্যক্ষ।

তেঁতুলঝোড়া কলেজের অধ্যক্ষ মো. ইউনুছ আল মামুন তার কলেজের মিশন এবং ভিশন সম্পর্কে বলেন, আধুনিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে পরিবর্তীত শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কাজ করবে তেঁতুলঝোড়া কলেজ। যেন দক্ষপ্রজন্ম গড়ে তুলতে অবদান রাখতে সক্ষম হয় প্রতিষ্ঠানটি।

‘জিপিএ কম পাওয়া শিক্ষার্থীদের অবহেলা করা যাবে না’
শাহ্নাজ বেগম, অধ্যক্ষ, কল্যাণপুর গার্লস কলেজ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ‘বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য-২০১৮’-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন মাধ্যমিকে ছেলেদের ঝরে পড়ার হার ৩৬ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ; যা আগের বছর ছিল ৩৩ দশমিক ৪৩ শতাংশ। আর ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ৪০ দশমিক ১৯ শতাংশ। শিক্ষার্থীদের ঝরে পরার এই প্রবণতা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও খুব বেশী এবং তা কমছে না। কিন্তু কেন? প্রশ্নটি নিয়ে ***কল্যাণপুর গার্লস স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ শাহ্নাজ বেগমের মুখোমুখি হয়েছিলেন তারসিয়া আলম।***

শাহ্নাজ বেগম জানান, এর পেছনে মূল কারণ পারিবারিক অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, যোগাযোগের অসুবিধা ও যাতায়াতে নিরাপত্তাহীনতা।

তিনি আরও কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভালো শিক্ষার পরিবেশ ও সুযোগ না পাওয়া, এস.এস.সি ও এইচ.এস.সিতে জিপিএ কম পাওয়া, চাকরির পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যুগোপযোগী সুযোগ তৈরি না হওয়া।

এদিকে যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না, তারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে অর্জিত শিক্ষা প্রয়োগের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে, ভুলে যায় এবং বিশাল এক জনগোষ্ঠী যোগ হচ্ছে অদক্ষ জনবলের খাতায়।

আবার প্রাথমিক স্তর থেকে ক্রমে ওপরের দিকে শিক্ষার ব্যয় যখন ক্রমে বাড়তেই থাকে তখন শিক্ষা অন্বেষণের থেকে জীবিকা অন্বেষণ জরুরি হয়ে পড়ে।

শাহ্নাজ বেগমের পরামর্শ- মেধাবী ও সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের স্বল্প খরচে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে-পছন্দসই বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। বিশেষ করে যেসব শিক্ষার্থীদের জিপিএ কম তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক বাধামুখে পড়তে হয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। এই বাধা দূর করতে হবে। অনেকে সুযোগের অভাবে ভালো রেজাল্ট করতে পারে না তারপর যদি তাকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে একটি হতাশ প্রজন্ম তৈরি হবে। এই দায়, এই ক্ষতি পুরো জাতি ও দেশের। কম জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীদের অবহেলা না করে উৎসাহ দিয়ে উচ্চশিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ করে দিতে পারলে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমতে পারে।

“শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেয়া যাবে না”

মোর্সেদা বেগম, অধ্যক্ষ, মোফাজ্জল মোমেনা চাকলাদার মহিলা ডিগ্রী কলেজ

একটি নয়, বরং একাধিক কারণ রয়েছে যেগুলো একজন শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারে বলে মনে করেন, মোর্সেদা বেগম। তার সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন মো. মেহেদী হাসান।

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে শিক্ষার্থীরা যেসব কারণে বঞ্চিত হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে এই অধ্যক্ষ বলেন, পড়ালেখা চলাকালীন বিয়ে হয়ে যাওয়া অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়া অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতা, শিক্ষার্থীর অনাগ্রহ ও সঠিক তথ্য না জানা। মোর্সেদা বেগম আর একটি কারণকে বড় করে দেখেন, তা হলো- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব এবং অপর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা।

সমস্যা যখন একাধিক তখন সমস্যা দূরীকরণেরও রয়েছে একাধিক ধরণ, প্রক্রিয়া ও উপায়। মোর্সেদা বেগম এর কিছু পরামর্শ হলোঃ

- শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেয়া যাবে না।
- অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়াতে হবে।
- উচ্চশিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে হবে, এই উদ্যোগ নিতে হবে কলেজ শিক্ষকদের, পিতামাতার এবং সকল পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকেও।
- মাসিক বৃত্তি প্রদান বা কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করতে হবে।
- পছন্দের বিষয় নিয়ে যেন পড়তে পারে সেই অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান **নির্বাচন করবে একজন শিক্ষার্থী, যেন পুরো শিক্ষাজীবনটা তার কাছে আনন্দদায়ক আর ফলপ্রসূ হয়।**

‘জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে হবে’
দিল আফরোজা শামীম, উপাধ্যক্ষ, সাভার সরকারি কলেজে

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যাওয়া তার জন্য যেমন দু:খজনক একই সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর পরিবারের জন্যও। কিন্তু অহরহ এই ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা আরও বেশি। **দিল আাফরোজা শামীম** মনে করেন জেন্ডার বৈষম্য পুরোপুরি দূর করা না গেলে এই প্রবণতা কমানো সম্ভব নয়। দিল আফরোজা শামীমের সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন **মো. মেহেদী হাসান**।

সাভার সরকারি কলেজের এই স্বনামধন্য উপধ্যক্ষ বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছেন, যেগুলো উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায়। সমস্যাগুলোঃ

- জেন্ডার বৈষম্য
- দারিদ্র্য
- বিবাহ
- কুসংস্কার
- পারিবারিক কলহ
- তথ্যের অপর্যাপ্ততা
- পরিবহণে নিরাপত্তাহীনতা
- সামাজিক বৈষম্য-নারীর প্রতি অনুদার পরিবেশ।

এসব সমস্যা দূর করতে দিল আফরোজা শামীমের পরামর্শ হলো- সামগ্রীক পর্যায়ে আর্থিক সমস্যা দূর করতে হবে এবং পরিবারের অভ্যন্তরে ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তানের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ পুরোপুরি দূর করতে হবে। এ জন্য পরিবারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, পাশাপাশি পিতামাতাকে সচেতন করে তুলতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ থাকতে হবে।
আধুনিক জটিল জীবনে অনেক পরিবারে পিতা-মাতার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি থাকলে সন্তানের পড়ালেখা থেমে যেতে পারে, তাই পারিবারিক শান্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মা-বাবা উভয়কেই উদ্যোগী হতে হবে। মনে রাখতে হবে, উচ্চশিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের ঝোঁক কেবল নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি। সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা দরকার শিক্ষার্থী তার আগ্রহের বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে কি না। যদি না পায়, সেক্ষেত্রে দিল আফরোজা শামীমের পরামর্শ হলো- প্রতিষ্ঠান নয় বরং আগ্রহের বা পছন্দের বিষয়ে পড়ার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে।

আর্থিক অসঙ্গতিই শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রধান কারণ
মো. ইশতিয়াক উজ্জামান, অধ্যক্ষ, কলেজ অব ফাইন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট

দেশে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া একটি বড় সমস্যা। প্রাথমিক পর্যায়েই এই সমস্যা প্রকট মাধ্যমিক এবং উচ্চস্তরেও উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার জাতীয় সংসদে তুলে ধরেন। মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ সালে ৫৫.৩১%, ২০১০ সালে ৫৫.২৬%, ২০১১ সালে ৫৩.২৮%, ২০১২ সালে ৪৪.৬৫%, ২০১৩ সালে ৪৩.১৮%, ২০১৪ সালে ৪১.৫৯%, ২০১৫ সালে ৪০.২৯%, ২০১৬ সালে ৩৮.৩০%, ২০১৭ সালে ৩৭.৮১% এবং ২০১৮ সালে ৩৭.৬২% শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে।
শিক্ষামন্ত্রীর এ তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আশার কথা হচ্ছে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার দিন-দিন কমছে। ২০০৯ সালে ছেলেদের ঝরে পড়ার হার ছিল ৪২.১৫% আর মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৬৩.৯৩%। ২০১৮ সালে ছেলেদের ঝরে পড়ার হার ৩৬.০১% আর মেয়েদের ৪০.১৯%। শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখিত কারণ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ দারিদ্র, অভিভাবকের অসচেতনতা, শিশুশ্রম, অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী।
কথা হচ্ছে, যে শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরেই ঝরে যায় তার জন্য মাধ্যমিকসহ উচ্চস্তরের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আর যে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে এসে ঝরে যায় সে উচ্চস্তরের শিক্ষা থেকে সামান্য দূরেই থামিয়ে দেয় তার শিক্ষা জীবন। একই সুরে সুর মিলিয়ে কলেজ অব ফাইন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্টের অধ্যক্ষ বলেন, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করতে হলে সমাজ থেকে আর্থিক অসঙ্গতি দূর করা প্রয়োজন। আর এ জন্য সমাজের উন্নয়ন হওয়া দরকার ভারসাম্যপূর্ণ।
মো. ইশতিয়াক উজ্জামান আরও কিছু কারণকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ হিসেবে দায়ী করেনঃ

- পরীক্ষা পদ্ধতি
- প্রায়োগিক শিক্ষার অভাব অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ চাকরির সুযোগ না পাওয়া
- পরিবেশগত শিক্ষা সংকট।

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমাতে হলে, সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতির যুগোপোযোগী সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন মো. ইশতিয়াক উজ্জামান। তিনি আরও মনে করেন, জীবনমুখী শিক্ষার প্রসার, কারিগরি শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা গেলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমতে পারে।

উচ্চশিক্ষা স্তরে এসে পছন্দের প্রতিষ্ঠান আর পছন্দের বিষয়ে পড়ার সুযোগ একই সঙ্গে হয়ে ওঠে খুব কম। সেক্ষত্রে পছন্দের বিষয় যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পড়া যাবে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন মো. ইশতিয়াক উজ্জামান।

প্রস্তুতি ভালো না থাকার ফলেও ঝরে যায়
মো.মহসিন, অধ্যক্ষ, মির্জা গোলাম হাফিজ কলেজ।

'দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ যেমন দরকার তেমনি সকল বিত্তের শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে শিক্ষা ব্যায়। গুরুত্ব দিতে হবে কারিগরি শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার গুণগতমান বাড়লে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ যেন না বাড়ে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে'- বলছিলেন মো. মহসিন, অধ্যক্ষ, মির্জা গোলাম হাফিজ কলেজ।

মো. মহসিন আরও বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত না করেই অনেকে জীবিকার তাগিদে কাজ বেছে নেয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ে হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে, আবার প্রস্তুতি ভালো না থাকার ফলেও অনেকে শিক্ষা মাঝ পথে থামিয়ে দেয়। কেউ কেউ মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে- সহপাঠীদের জীবন-যাপনের সঙ্গে নিজের জীবন যাপনে সামঞ্জস্য না পেয়ে।

সমস্যা সমাধানে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

'দিক নির্দেশনার অভাবে ঝরে যায় অনেক শিক্ষার্থী'
মো. আসাদুজ্জামান আসাদ, সহকারি অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ।

'সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে অনেক শিক্ষার্থী নিজেদের সঠিক গন্তব্য ঠিক করতে পারে না। আবার পছন্দের বিষয় ও পছন্দের প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগ সময় মেলাতে ব্যর্থ হয় শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে আর্থিক অসচ্ছলতাও শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ' বলছিলেন- মো. আসাদুজ্জামান আসাদ।

শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে তার পরামর্শ হলো-

১. কম জিপিএ নিয়েও একজন শিক্ষার্থী যেন তার পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতা যাচাইয়ের সুযোগ পায়- সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আবার শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে পড়বে এ বিষয় তাকেই ঠিক করতে দিতে হবে।
২. প্রাতিষ্ঠানিক এবং সরকারিভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় থেকেই উচ্চশিক্ষার দিক নির্ধারণে সহায়ক নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের দিতে হবে।
৩. শিক্ষাক্ষেত্রগুলো ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে নিরাপদ হতে হবে।
৪. শিক্ষার্থীদের জন্য খণ্ডকালীন চাকরির পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

পারিবারিক দারিদ্র্যতার কারণে উচ্চশিক্ষা বঞ্চিত হয় শিক্ষার্থীরা

মো. মোশাররফ হোসেন, সহকারি অধ্যাপক, আইসিটি বিভাগ-ভালুম আতাউর রহমান খান কলেজ।

বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) সূত্রমতে, ২০০০ সালে কলেজশিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার ছিল ৪১ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১৪ সালে তা নেমে আসে ২৩ দশমিক ২৩ শতাংশে। এছাড়া ২০১০ সালে কলেজশিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমে দাঁড়ায় ২৬ দশমিক ২৯ শতাংশ। ২০১১ সালে তা আরো কমে হয় ২৩ দশমিক ৩৬ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, মনোযোগের অভাব ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্বাভাবিক ব্যয়ের কারণে উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা শেষে চাকরির বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার বিষয়টিও বড় কারণ বলে মনে করছেন তারা।

ভালুম আতাউর রহমান খান কলেজের সহকারি অধ্যাপক মো. মোশাররফ হোসেন বলেন- উচ্চশিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হলো

১. পারিবারিক দারিদ্রতা
২. মাদকাসক্তি
৩. অপ-রাজনীতির শিকার হওয়া
৪. বেকারত্ব

এই সহকারি অধ্যাপকের পরামর্শ হলো- অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে সবার আগে। এরপর যুগোপোযোগী শিক্ষাদানে প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। নকল প্রতিহত করতে হবে। নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি মনে করেন- শিক্ষাথীর আগ্রহের বিষয়ে যাতে পড়ার সুযোগ নিশ্চিত হয় পাশাপাশি ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ হয় দুই'ই গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষা বিভাগ পাসের কোটা বেঁধে দিলে ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো নকল করতে দেখেও দেখবে না। সেক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। আর অভিভাবকদের সন্তানের সক্ষমতা বুঝতে হবে।

ব্যবসায় প্রশাসন: গতানুগতিক না সময়োপযোগী?

ড. ফারজানা আলম

অ্যাসোসিয়েট ডীন, ফ্যাকাল্টি অব্ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

জীবন একটাই, ছাত্রজীবনও একটাই। যদিও জানার কোন বয়স বা সীমাবদ্ধতা নেই তবুও আনুষ্ঠানিক ছাত্রজীবন খুবই সীমিত।নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর ছাত্রজীবনে থেকে যাওয়ার আর কোন উপায় থাকে না। যা জানার এরই মধ্যে জেনে নিতে হয়। যা কিছু আনন্দের, তাও এরই মধ্যে উপভোগ করতে হয়।একবার কেউ ডাক্তার হয়ে গেলে তার আর এই জীবনে পেশাদার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার উপায় থাকে না। আমরা কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছি তার উপরই আমাদের পেশা কি হবে, তা অনেকটা নির্ভর করে। প্রতিটি বিষয় আমাদের কর্মজীবন গড়ে দিতে কেমন ভূমিকা রাখে তা আলাদা আলাদা করে জানার প্রয়োজন আছে। সব বিষয় আমার আজকের আলোচনার বিষয় নয়, বরং সুন্দর একটি কর্মজীবন গড়ার জন্য ব্যবসায় প্রশাসনে উচ্চশিক্ষা কতোটুকু সহায়ক সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

BBA কি?: ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এটি হলো মর্যাদাসম্পন্ন একটি একাডেমিক ডিগ্রী। যেখান থেকে সহজেই নানান চাহিদা সম্পন্ন প্রফেশনাল ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব। ৪ বছর মেয়াদি এই প্রোগ্রামে **"জ্যাক অব অল ট্রেডস"** তৈরি করা হয় যা কিনা পরবর্তীতে ইচ্ছা করলেই ব্যবসায় প্রশাসনে তার পছন্দের যেকোন এরিয়াতে (ফিন্যান্স, একাউন্টিং, মার্কেটিং, হিউম্যান রিসোর্স ইত্যাদি)তে মাস্টার্স সম্পন্ন করতে পারে। কাজেই **"জ্যাক অব অল ট্রেড"** হলেও **"মাস্টার অব নান"** হওয়ার সুযোগ এখানে নেই।

আনলিমিটেড চাকরির বাজার: বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ। ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ছে। এই ডিগ্রী ভালো পরিচালক এবং ব্যবস্থাপক তৈরি করে। সরকারি, বেসরকারি, বহুজাতিক কোম্পানি, ব্যাংক, বীমা, টেলিকমিউনিকেশন, এনজিওসহ সব ক্ষেত্রের এনট্রি লেভেল থেকে মাঝারি এবং শীর্ষ পর্যায়ে ব্যবসায় প্রশাসনে ডিগ্রীধারীদের প্রয়োজন থাকবেই। প্রতিষ্ঠান যে প্রকারেরই হোক, তার শীর্ষ পর্যায়ে যিনি থাকেন তিনি আসলে Manager, Director, MD, CEO, তাকে ব্যবসাটা বুঝতেই হয়। BBA প্রোগ্রাম তাকে এই ব্যবসা বুঝতে সাহায্য করে।

ভালো উদ্যোক্তা হতে চাইলে এই ডিগ্রী ভীষণ রকম সহায়ক। কারণ এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট BBA সিলেবাসেরই অংশ।

সফ্ট স্কিল: বলা হয়ে থাকে অ্যারোপ্লেন চালানোর থেকেও ১০জন মানুষকে পরিচালনা করা অনেক কঠিন। মানুষ বেতনের অভাবের চাইতে অনুপ্রেরণার অভাবে চাকরি ছাড়ে বেশি। মোটিভেশন, লিডারশীপ এই দক্ষতাগুলো কোন একক দিক দিয়ে মাপা যায় না। সংখ্যা দিয়ে মাপা যায় না বলে এসব দক্ষতাকে বলা হয়ে থাকে সফ্ট স্কিল। ব্যবসায় প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে শেখানো হয়, কেস স্টাডিসহ। আর কে না জানে বাংলাদেশে কাজের সুযোগ কতো অবারিত। একটু চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যাবে বাংলাদেশের বহুজাতিক

কোম্পানি গুলোতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনেকেই বিদেশী। পোশাক শিল্প খাত থেকে শুরু করে টেলিকমিউনিকেশন সকল ক্ষেত্রে প্রচুর বিদেশীরা কাজ করছে। ইমপোর্টেড ম্যান পাওয়ার সব সময়ই এক্সপেনসিভ। এই ঘাটতিটুকু তো আমাদের দেশের ইইঅ গ্রাজুয়েটরা সহজেই পূরণ করতে পারবে। চাকরির কিন্তু অভাব নেই-অভাব কেবল দক্ষতায়।

ACCA, ICMA: এর মতো নামকরা উচ্চবেতন সম্পন্ন প্রফেশনাল ডিগ্রীগুলো নেয়া সহজ হয়। দেশবিদেশে এই ডিগ্রীধারীদের প্রচুর চাকরীর সুযোগ রয়েছে।

ক্রিয়েটিভিটি দেখানোর সুযোগ: BBA প্রোগ্রামে নিজের ক্রিয়েটিভিটি দেখানোর জন্য বিরাট সুযোগ রয়েছে। যেকোন ক্রিয়েটিভ চিন্তাভাবনাকেই শেষ পর্যন্ত BBA প্রোগ্রামের দ্বারস্থ হতে হয়। দক্ষ ও চৌকস পরিচালক হবার জন্যে এই ডিগ্রী বিকল্পহীন, ক্যারিয়ারে প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ে থেকে অথবা আপনি নিজে যখন উদ্যোক্তা হবেন মোটামুটি সব কিছু বুঝতে সহজ হবে। আর সব বুঝতে পারলে তবেই ঠিকঠাক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। ব্যবসায় প্রশাসনের এই প্রোগ্রাম আপনাকে সব বিষয়ে কিছু প্রাথমিক ধারণা দেবে। যে কোন কোম্পানির ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখলে আপনি অসহায় বোধ না করে বা কর্মীদের বেতন, বোনাস, ছুটির ব্যবস্থা করতে গিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় যেন না ভোগেন ব্যবসায় প্রশাসনের শিক্ষা আপনাকে এই নির্দেশনা দেবে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য BBA পড়ায় উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করা নয়। বরং আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেন সচেতন হতে পারেন সেই জন্য। যদি BBA পড়তে চান, তাহলে BBA কি, কোন বিষয় মেজর করতে কি কি যোগ্যতা লাগে, এই ডিগ্রী গ্রহণের পর ঐ শিক্ষার্থীর জন্য কেমন পরিস্থিতি এবং সুযোগ অপেক্ষা করছে যেন সব জেনে বুঝে এডুকেশন মেজর নির্ধারণ করতে পারে-তার জন্যই এই লেখা।

পৃথিবীতে চাকরির সংকট যেমন প্রকট, চাকরির বাজারে যোগ্য লোকেরও কিন্তু তেমন অভাব রয়েছে। প্রতিযোগিদের অভিযোগ- মামা, চাচা, লবিং ছাড়া চাকরি হয় না। আর চাকরিদাতাদের অভিযোগ মেধার অভাব, যোগ্য লোক পাওয়া যায় না। আসলে সমস্যাটা অন্য জায়গায়। ক্যারিয়ার নির্বাচনে এখনও আমরা ক্যাজুয়াল। আমরা না জেনেশুনে না বুঝেই অভিভাবকদের কথায় প্রভাবিত হয়ে কিংবা বন্ধুদের দেখাদেখি কিংবা সুযোগ পেলাম বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন সাবজেক্টে ভর্তি হয়ে যাই। সেই বিষয় যদি আমার সাথে মানানসই হয় তবে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এক এক ধরনের বিষয়ের জন্য এক এক ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন হয়। উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেকোন ভুল আমাদের ক্যারিয়ারে মারাত্মক বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে। আমি ব্যবসায় প্রশাসন নিয়েই বলি, যে ছাত্র-ছাত্রী কথাবার্তা বলতে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, তিনি যদি বাইরের যেকোন চাপে মার্কেটিং কে মেজর হিসেবে নিয়ে বসেন তার ক্যারিয়ারতো অবশ্যই, ব্যক্তিজীবনও হয়ে পড়বে দু:সহ। কিংবা যে ছাত্র-ছাত্রী গণিতে ভয় পায়, তাকে যদি ব্যাংকার কোন মামা চাচা ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিষয় মেজর করতে বলে, এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর হতে পারে না। প্রচণ্ড ক্রিয়েটিভ এবং মুভিং প্রকৃতির কাউকে যদি অ্যাকাউন্টিং পড়ে হিসাব বিভাগে

কাজ করতে হয়, এর চাইতে দু:খজনক আর কি হতে পারে। তিনি হয়তো কোন রকম চাকরিটা রক্ষা করতে পারবেন কিন্তু মার্কেটিংয়ে পড়লে তিনি হয়তো আরও ভালো করতে পারতেন।

পড়াশোনা শেষ হলে আমরা আর ছাত্র-ছাত্রী থাকিনা, আমাদের ছাত্র-ছাত্রী বলাও হয় না। আমরা আমাদের পেশার নাম দিয়েই পরিচিত হই। ছাত্র-ছাত্রী হয়ে নয় বরং ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার হয়েই আমরা মৃত্যুবরণ করি। নিজের নামের পরে পেশার নামই আমাদের চিরস্থায়ী নাম। সেই পেশা নির্বাচনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে আমাদের উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তু। তাই Major Subject নির্বাচন একটি অত্যাধিক জরুরী বিষয়। নিজের ক্যারিয়ার গড়ার জন্যে BBA একটি চমৎকার প্রোগ্রাম। একটু নিয়মিত ক্লাস এবং পড়াশোনা করলে এবং বাইরের জগত সম্পর্কে চোখকান খোলা **রাখ**লে কথা দিতে পারি, বেকার থাকার কোন আশঙ্কা তো নেই বরং BBA ডিগ্রীধারীরাই বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে পারে।

ডিজিটালযুগের শ্রেষ্ঠ, প্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত ক্যারিয়ারের জন্যই আইপিই
ড. আবু তাহের

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই)
একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে তার শিল্প উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ওপর। আমাদের মত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে এর অবদান অনস্বীকার্য, যা আমরা সবাই অনুধাবন করতে পারছি। কারণ যে দেশে শিল্প উৎপাদন যত বেশি, সে দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত বেশি শক্তিশালী। যেমন দক্ষিণ কোরিয়ার কথা বলি, ১৯৭১ সালে তাদের মাথাপিছু আয় ছিল ৩০০ মার্কিন ডলার আর আমাদের ছিল ১৩২ মার্কিন ডলার। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এখন দক্ষিণ কোরিয়ার মাথাপিছু আয় ২৭,৫৩৯ মার্কিন ডলার যা বর্তমানে আমাদের থেকে ২৫,৭১২ মার্কিন ডলার বেশি যা (একটা বিরাট ব্যবধান)। এটা সম্ভব হয়েছে তাদের শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে। সুতরাং উৎপাদন বাড়াতে আজ পৃথিবীর সকল দেশ আধুনিক শিল্পায়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু কোন মান সম্মত পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণ, কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকের নির্দেশনা, যন্ত্রের সর্বোচ্চ ব্যবহারসহ বেশ কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। আর এসব ধাপ অতিক্রম করতে দরকার হয় সুদক্ষ শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলী, যাঁদের নেতৃত্বে একটি কোম্পানি তার স্বপ্ন চূড়ায় পৌঁছাতে পারে। আর এসকল কারণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই) একটি অতি জনপ্রিয় ও আদর্শ পেশা হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ পৃথিবীর সকল উন্নত দেশে আইপিই পেশার মান ও পেশাজীবীর সংখ্যার দিক থেকে অনেক উপরে অবস্থান করছে।

আইপিই ও বাংলাদেশ
আইপিই হল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্টর সমন্বয়ে গঠিত একটি ইনোভেটিভ বিষয় যেটি বাংলাদেশের মানুষের মাঝে এখনো সেভাবে পরিচিতি লাভ করেনি। তবে এই ডিজিটাল যুগে আধুনিকতা ও পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে উৎপাদন ক্ষেত্রে কতটুকু নিজেদের অভিযোজন করে মানিয়ে নিতে হবে, তা আইপিই নির্ধারণ করে দিবে। কারন একটি ইনোভেটিভ ধারণা বা উদ্ভাবন জগতকে পরিবর্তন করে দেয় তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাষ্পীয় ইঞ্জিন, যা পুরো পৃথিবীকে শিল্প বিপ- বের দিকে নিয়ে গেছে। আমেরিকা, কানাডা ও রাশিয়ার মত উন্নত দেশগুলিতে এই সাব্জেক্টটি অনেক আগেই পরিচিতি লাভ করেছে এবং দক্ষিণ

এশিয়ার মধ্যে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি ১৯৭৪ সালে প্রথম এ বিষয়টি চালু করে। কিন্তু আমাদের দেশে আইপিই এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৭ সাল থেকে।

বর্তমানে আইপিই-এর দেশে ও বিদেশে প্রচুর চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমাদের দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইপিই ইনোভেটিভ ও যুগোপযোগী বিভাগ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (চিত্র-১)। এ বিষয়টি অদূর ভবিষ্যতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে আবির্ভূত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন অনেক প্রতিষ্ঠান এখনই আইপিই গ্রাজুয়েট চেয়ে আমাদের কাছে লিখছে।

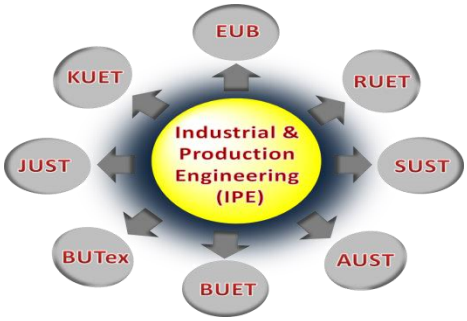

চিত্র-১: যেসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইপিই পড়ানো হয়।

এই বিভাগে প্রোডাক্ট ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনাসহ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সকল মৌলিক বিষয়ই পড়ানো হয়, ফলে একজন আইপিই ইঞ্জিনিয়ার কাঁচামাল থেকে ফিনিশ প্রোডাক্ট এবং সর্বশেষ বাজারজাতকরণসহ সকল বিষয়ই দক্ষতা অর্জন করে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের উপরও ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেমন- কীভাবে উপস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানো যায়, কীভাবে দলগতভাবে সুচারুরূপে কাজ সম্পন্ন করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আশার কথা হল চাকরি ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন বিষয় হওয়ায় বর্তমানে বংলাদেশ তথা বহির্বিশ্বে আইপিই ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ কোম্পানিগুলো বুঝতে পেরেছে তাদের আইপিই স্পেশালিষ্ট দরকার। বড় বড় কোম্পানিগুলোতে এখন আইপিই নামে আলাদা একটা সেক্টর আছে। যেখানে আইপিই ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ হচ্ছে। মজার ব্যপার হল, এ সেক্টরগুলো আগে অন্য ইঞ্জিনিয়ারেরা পরিচালনা করত।

ডিজিটাল যুগের শ্রেষ্ঠ, প্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত ক্যারিয়ারের জন্যই আইপিই

আইপিই এর পূর্ণ রূপ হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলায় যাকে বলা যায় শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশল। আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কথাটা শুনলেই মনে হতে পারে শব্দ ও ধোঁয়া নির্গত কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে বা কলকারখানাতে লোকজন কাজ করছে। কিন্তু আইপি ইঞ্জিনিয়ার মানেই যে শুধুমাত্র শব্দ ও ধোঁয়া নির্গত কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে বা কলকারখানাতে কাজ করবে এই ধারণা আজ ভিন্ন এবং এটি এমন একটি বিষয়, যদি এটির ব্যপারে কেউ চিন্তা করেন, তাহলে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ও আলোকিত ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন কারণ একজন আইপি ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। আইপিই ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্ট এর সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি গুরুত্তপূর্ণ সাবজেক্ট যা বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং জগতে এক আলোচিত নাম। এটি বুয়েটের একটি অন্যতম জনপ্রিয় বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং অন্যান্য অনেক বিভাগকে অতিক্রম করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসাবে দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে স্থান করে নিয়েছে (চিত্র-১)।

আইপিই এর কর্মক্ষেত্রকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং, ম্যানেজমেন্ট সেক্টর এবং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সেক্টর হিসাবে দেখানো যায় (চিত্র-২)।

চিত্র-২: আইপিই এর কর্মক্ষেত্র

দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি, ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, এ ছাড়াও ইয়াহু, ইনটেল এর মত বড় বড় জায়গায় রয়েছে আইপি ইঞ্জিনিয়ারের ব্যাপক চাহিদা। যেমন- গার্মেন্টস, টোবাকো ,ওয়াল্টন, ইউনিলিভার, পেপসিকো, আকিজ গ্রুপ, বিএসআরএম, এসিআই, সিংগার, পিএইচপি, ভিয়ালাটেক্স, থারমেক্স গ্রুপ, এফসিআই, নেসলে, প্রান, গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, অটবি, রহিম আফরোজ, ডিবিএল গ্রুপ, হাতিল, নাভানা, কোহিনুর কেমিকেল, স্কয়ারসহ অসংখ্য ন্যাশনাল ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে রয়েছে আইপি ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরির বিশাল সুযোগ। এমনকি হাসপাতালের ব্যাবস্থাপনায় ও পারমাণবিক সেক্টরের দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য আইপি ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন। এছাড়া বাংলাদেশে এখন নতুন করে ১০০টি ইকোনমিক জোন হচ্ছে যেখানে ১৫০০ এরও অধিক ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে। সুতরাং আইপিই স্পেশালিষ্টদের চাকরির বাজার দিন দিন বাড়তেই থাকবে। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্ট এর কম্বিনেশন একসাথে থাকায় আইপিই স্পেশালিষ্টদের চাকরির পরিধি বিশাল।

আইপিই ইঞ্জিনিয়ারের কাজের ধরন

আইপিই প্রধানতঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ দুইটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি প্রকৌশল শাখা, যা পরিকল্পনা প্রণয়ন, পণ্য উৎপাদন, উৎপাদন খরচ কমানো, এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এ সর্বাগ্রে ও প্রধানত যে কাজগুলো করা হয় তা হলো অপটিমাইজেশন। যার অর্থ হল সীমিত রিসোর্স ব্যবহার করে সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়া। আসলে এর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে জনবল, অর্থ, মেশিনসহ সকল রিসোর্সের সর্বোত্তম ব্যবহার। এইসব রিসোর্স ম্যানেজ করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছান কঠিনতম কাজ। আর এখানেই জাদুকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় আইপিই। যেমন- একটা ফ্যাক্টরিতে ঠিক কি পরিমাণ কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে, প্রোজেক্ট পরিচালনায় কাকে দায়িত্ব দিতে হবে, কিভাবে প্ল্যান করলে প্রজেক্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হবে, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কিভাবে অতিক্রম করতে হবে, কাজের মাঝে প্ল্যানিং এ কোন চেঞ্জ আসলে কি করতে হবে, প্রোডাকশনের টার্গেট ঠিক করতে এবং মার্কেট ডিমান্ডকে কভার করতে কি পরিমাণ প্রোডাক্ট লাগবে এই সব কিছুই আইপিইতে অতি যত্ন সহকারে পড়ানো হয়।

আবার প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাকশনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো পড়ানো হয়। এখানে কাঁচামাল থেকে শুরু করে ফাইনাল প্রোডাক্ট এমন কি ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত সব ধাপগুলোর সুন্দরভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া অপারেশন্স ম্যানেজমেন্ট ও এখানে পড়ানো হয় যা প্রোডাকশন সিস্টেম নিয়ে জানতে ব্যাপক সাহায্য করে।

আইপিই ইঞ্জিনিয়ারের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল সে নিজেকে সবার মাঝে স্মার্টভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে। ফলে আইপিই ইঞ্জিনিয়ার সকল বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে একজন পরিপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে নিজেকে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে।

আইপিই গ্রাজুয়েটদের উচ্চতর ডিগ্রি করার সুযোগ

আইপিই থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে এমএসসি ও পিএইচডিরমত উচ্চতর ডিগ্রি করার ব্যাপক সুযোগ দেশ ও দেশের বাইরে অনেক নামকরা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। আর উচ্চতর ডিগ্রি করার জন্য রিলেটেড অনেক বিষয় রয়েছে, যেমন- প্রোডাক্ট ডিজাইন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটিক্স, সাপ্লাই চেইন, থ্রি-ডি প্রিন্টিং, আর্গনোমিক্স, ক্যাড, ক্যাম সহ আরও অনেক আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন আইপিই গ্রাজুয়েটকে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে উচ্চতর ডিগ্রি করার জন্য বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশ নির্বাচন করতে হবে। কারণ এটার উপর নির্ভর করছে তার পরবর্তী কর্ম জীবন। এখান থেকে সে বিল গেটস, স্টিভ জব্‌স বা মার্ক জুকারবার্গ এদের মত বিশ্বের সেরা উদ্ভাবক হয়ে উঠতে পারে, তৈরী করতে পারে মাইক্রোসফটেরমত বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। আর গ্রাজুয়েশন, আইইএলটিএস (ইংলিশ দক্ষতা) এবং জিআরই ভাল স্কোর থাকলে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, কোরিয়া সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সহজেই পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

পরিশেষে বলব, আইপিই এমনই একটি সাবজেক্ট যেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে চাকরি কাউকে খুঁজতে হবেনা বরং চাকরি তাকে খুঁজবে।

লেখক :সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, মিরপুর-১, ঢাকা।

drtaher@eub.edu.bd

আমাদের শিক্ষকেরা

ড. ফারজানা আলম

অ্যাসোসিয়েট ডীন, ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

এই ম্যাগাজিনের দায়িত্বে থাকা রাশিদা স্বরলিপি ম্যাডাম নাছোড়বান্দা চরিত্রের মানুষ। অপরিসীম ধৈর্য্য নিয়ে তিনি একটা লেখা চেয়েই যাচ্ছিলেন। যতোই কেটে পড়ি বা উপেক্ষা করি-তার ধৈর্য্যের ভাটা পড়েনা। শিক্ষকদের প্রিয়শিক্ষক নিয়ে তার আগ্রহ সীমাহীন।

এই বিষয়ে ভাবতে বসে একটু বিব্রত হলাম। এককভাবে বলার মতো কোন শিক্ষকের নাম তো মনে পড়ছেনা। আমার আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে গেছে। ওই সময়ের মধ্যে অনেক অনেক ভালো শিক্ষক পেয়েছি কিন্তু আমার শিক্ষানবিশকালতো শেষ হয়নি। বরং চাইলেই যে সব কিছু শেখা যায়না তা আমি শিখেছি আমাদের ইইউবি'র ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর স্যারের কাছে। বাংলা বলার সময় শুদ্ধ বাংলা, ইংরেজির সময় চমৎকার ইংরেজি বলেন। ইংরেজিতো দূরের কথা উনার মতো শুদ্ধকরে বাংলা উচ্চারণ করা আজও আমার হয়ে উঠলো না, কখনোই হবে না। চেষ্টা করে কয়েক দিনের মাথায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি। এতোটা মেধা আল্লাহ আমাকে দেন নি, এই শিক্ষা নিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছি।

আশাবাদী হতে শিখেছি ইইউবি'র উপাচার্য প্রফেসর ড. মকবুল আহমেদ খানের কাছে। কাছ থেকে দেখেছি যে আশাবাদী মনোভাব অত্যাধুনিক অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী আর নিরাশাবাদী মানুষ নিজেই নিজের শত্রু। তাঁর আর আলাদা কোন শত্রুর প্রয়োজন পড়ে না। ক্ষমতার সঙ্গে মমতার আনুপাতিক ব্যবহার শিখিয়েছেন আমাদের রেজিস্ট্রার আ.ফ.ম গোলাম হোসেন স্যার। আমার কোন ক্ষমতা নেই কিন্তু মমতার প্রয়োজনীয়তাটা জানার দরকার ছিল। সফল সচিব এবং রাষ্ট্রদূত ছিলেন বলেই হয়তো নিজের দেশকে কত দিক থেকে - কত রকম ইতিবাচক ভাবে দেখা যায়, তাঁর মতো ভালো করে আর কেউ জানে না।

আর একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর আলীমদাদ স্যার। দৈত্যাকৃতির সিভিল ডিপার্টমেন্ট তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী চেতনার একজন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, একইসঙ্গে আধুনিক ও বিচক্ষণ মানুষ । এমন ব্যক্তিত্ব রপ্ত করা আমার দ্বারা কোনদিনও সম্ভব হবেনা।

কিছু মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো সুখী থাকা। এদের কাছ থেকে দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। ড. হযরত আলী স্যার এবং ড. আবুল কালাম আজাদ স্যার কে দেখেছি। তাঁদের দেখে মনে হয় পৃথিবীতে সুখ ছাড়া দু:খ বলে কিছু নেই। তাঁদের মতো হাসিমুখে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝেছি কাজটা মোটেও সহজ নয়। কতোজনের কাছে কতো কি শিখেছি! বেশিভাগ মানুষের কথাই বাদ রয়ে গেল। এই পত্রিকাটি বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার জন্য। সেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকেও কি আমি কম শিখেছি! সারাদিন কাজ করে দিন শেষে আবার ক্লাস, একটি মাত্র ছুটির দিনের বিশ্রামকে নির্বাসন দিয়ে নিজের জীবনটা গড়ে তোলার জন্য কী সংগ্রামটাই না করছে তারা! তাদের মতো সংগ্রাম করতে জানলে হয়তো ভালো কিছু হতে পারতাম। আমার জীবনে কোন সংগ্রাম ছিল না।

বাবা আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন বা উপদেশ দিচ্ছেন- এরকম কোন স্মৃতি আমার শৈশব, কৈশরে নেই। তবে প্রচুর কথা হতো, এখনো হয়। তবে কথা বলার প্রসঙ্গগুলো বিচিত্র-দেশ বিদেশের দর্শনীয় স্থান, নাটক, সিনেমা, তারকা, কিংবা বই নিয়েই আলোচনা হয় বেশী। কিন্তু এরই মধ্যে কখন কোন ফাঁকে যে জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষাটা দিয়ে ফেলেছেন আমি বুঝতেই পারিনি। " Law of natural return " আমি যা দেবো তাই পাবো। মানুষের সাথে যেরকম ব্যবহার করবো আমার সঙ্গেও সেই রকমই ঘটবে, আমিও তাই পাবো। কোনও ব্যতিক্রম ঘটবে না। তাই বোধহয় সারাক্ষণ সতর্ক থাকি-কখন কাকে হিংসে করে ফেলি, কখন 'ইগো' আমাকে গ্রাস করে ফেলে আর আমি মানুষের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে ফেলি, দিন শেষে আমার ভাগ্যেও তো সেই একই পরিণতি হবে। আমার সাধারণ ছোট্ট একটা জীবন কাটিয়ে দেয়ার জন্যে এই একটা শিক্ষাই যথেষ্ঠ ছিল।

নিজের জীবনে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ববান বাবার উপস্থিতির কারণেই হয়তো শৈশব কৈশোরের শিক্ষকেরা আমার মনে তেমন কোন দাগকাটতে পারেননি। আজ আমি নিজে একজন শিক্ষক হলেও আমার কাছে "বিশ্ব জোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র"। আমিও ছাত্রকাল অতিক্রম করে যাইনি। নিজেকে একটি দিনের জন্যও কখনো পরিপূর্ণ শিক্ষক ভাবতে পারিনি। আমি যে অপরকে শিক্ষা দেব, আমি নিজেই কি নির্ভুল, মানসম্মত কিংবা বিশুদ্ধ? শিক্ষক হওয়া কি এতই সহজ!?

তাহলে এতো কুণ্ঠা নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি কেন? কারণ, এখানে যারা পড়তে আসে,তারা কেউ সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়নি। সুবিধাবঞ্চিত কিন্তু অপ্রতিরোধ্য। এতো অল্পে খুশি ছাত্র-ছাত্রী আমি আর দেখিনি। কতটুকুই বা সাহায্য করতে পারি আমরা? তারপরেও কত সম্মানটাই না আমাদের করে তারা! আশে পাশে তাদের আনন্দিত মুখগুলো দেখতে ভালো লাগে। আনন্দের সংজ্ঞা শিখেছিলাম প্রফেসর ইউনুস স্যারের কাছে।

"Making money is Happiness, making other people happy is Super Happiness" "

বাংলায় সঠিক উচ্চারণ
ফেরদৌস বাপ্পী,
ট্রেইনার-ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এ্যাণ্ড ইন্ড্রাস্ট্রি,
প্রাক্তন উপদেষ্টা গ্রামীনফোন

একজন বাংলাভাষী যে প্রকৃত দেশপ্রেমিক তার প্রথম ও প্রধান প্রমাণ হচ্ছে তিনি বাংলা শব্দের অর্থ জানেন, প্রমিত বানান জানেন এবং শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারেন। তাই সঠিক উচ্চারণ একজন খাঁটি বাঙালির অহংকার। শুদ্ধবাক্য ও শুদ্ধ উচ্চারণ একজন ব্যক্তির মার্জিত ও শালীনতার পরিচয়।

উচ্চারণ হলো শব্দের ধ্বনিগত প্রকাশ। ধ্বনির সাথে উচ্চারণের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শুধু ধ্বনির অবস্থান জানলেই উচ্চারণ সঠিক করা যায়। উচ্চারণের সাথে বাগযন্ত্রেরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যার বাগযন্ত্র অর্থাৎ ঠোঁট, দাঁত, তালু, জিভ, নাক, কণ্ঠ, ফুসফুস ইত্যাদি স্বাভাবিক নয় সে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হবে; কিন্তু যার বাগযন্ত্র স্বাভাবিক তবুও সে সফলভাবে শব্দ উচ্চারণ করতে পারছে না; তার তো বড় লজ্জা!

শুদ্ধ উচ্চারণ বাকশুদ্ধিরই একটি অংশ। মানুষের ভাষায় পরিচয় প্রকাশ পায় তার কথায় আর তার লেখায়। উভয় ক্ষেত্রেই ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা করা একান্ত অপরিহার্য। তবে কাজটি আপনা আপনি সুসম্পন্ন হয় না প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ছাড়া। এই নির্দেশনার কাজটি করে ব্যাকরণ। ব্যাকরণের যথার্থ জ্ঞান থাকলেই ভাষা নির্ভুল ও সুন্দর করা যায়।

যেনতেন করে শব্দ উচ্চারণ করলেই হবে না, একটি যুক্তিসংগত নিয়ম দরকার হয়। নিয়মের মাধ্যমে শব্দ যত শুদ্ধ করে উচ্চারণ করা হয় ততই সফলভাবে অপরের মন জয় করা যায়। প্রবাদের সঙ্গে মিলিয়ে বলা যায়, সুন্দর কথা বলার আবেদনও তেমনি সর্বজনীন।

ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণের ফলে মানুষ রুচিবান ও সংস্কৃতিমনা হয়ে ওঠে। লেখার বেলায় শুদ্ধ-অশুদ্ধের স্থায়ী রূপ থাকে বলে লেখক সচেতন থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু কথাবার্তা বলার সময় অনেকের শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে সজাগ থাকেন না। কেবল কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দানের সময় ভাষার নির্ভুল প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়।
শব্দ উচ্চারণের লিখিতরূপ হলো বানান তবে শব্দের উচ্চারণ ও লিখিতরূপ এক নাও হতে পারে। যেমন: অণু (ওনু,) কবি (কোবি), বধূ (বোধু), স্বাগতম (শাগোতোম), পদ্ম (পদদো), আত্মা (আৎতা), সমাস (শমাশ) ইত্যাদি। তবে প্রায় নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমেই এমনটি হয়ে থাকে। বর্ণানুসারে যদি বানান করতে যাই তাহলে বানান বিপর্যয় হবে। যেমন: পদ্ম, পদ্মা, আৎমা ইত্যাদি। যার ঠোঁট, দাঁত, তালু, জিভ, নাক, কণ্ঠ, ফুসফুস স্বাভাবিক নয় সে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হয় কিন্তু যার এগুলো স্বাভাবিক যে সফলভাবে উচ্চারণ করতে পারে। শব্দের উৎপত্তিগত কারণে শব্দের বানান ও উচ্চারণ এক নাও থাকতে পারে। শব্দ বানাতে প্রয়োজন হয় বর্ণ ও বর্ণচিহ্ন আর উচ্চারণে প্রয়োজন হয় ধ্বনি। ধ্বনি উচ্চারণে প্রয়োজন হয় বাগযন্ত্র। যাদের বাগযন্ত্র অর্থাৎ ঠোঁট, দাঁত, তালু, জিভ, নাক, কণ্ঠ, ফুসফুস স্বাভাবিক নয় তারাও শুদ্ধ উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আবার বাগযন্ত্র স্বাভাবিক থাকলেও অনেকে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ তারা উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন নয়।

খুব সহজ কিছু শব্দের উচ্চারণ-এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারেঃ ১ম টি শব্দের বানান, ২য় টি উচ্চারণের বানান । অতি= ওতি, কড়ি= কোড়ি, অসি= ওশি, অভিমান= ওভিমান, শরীর= শোরীর, নদী= নোদী, শশী= শোশী, বউ= বোউ, অনুকূল= ওনুকূল, অনুমান= ওনুমান, গরু= গোরু, লক্ষ (লোক্খো), কক্ষ (কোক্খো) দক্ষ (দোক্খো), বক্তৃতা (বোক্তৃতা), যকৃত (জোকৃত্), কর্তৃত্ব (কোরতৃত্তো), অন্য (ওন্নো), জন্য (জোন্নো), ধন্য (ধোন্নো), সচিত্র (সচিত্রো), সবিনয় (সবিনয়্), সসীম (শশীম্), সস্ত্রীক (শস্ত্রিক্), সতীর্থ (শতিরথো)। প্রথম (প্রোথোম্), প্রভাত (প্রোভাত্), ব্রত (ব্রোতো), শ্রম (শ্রোম্) পর্যন্ত, পোরজোনতো, পর্যায় পোরজায়, পর্যটন পোরজোটোন, পথচারী (পথোচারি), মেঘমালা (মেঘোমালা) যখন (যখোন্) তখন (তখোন্) পঠন (পঠোন্) ফসল (ফসোল্) ফলন (ফলোন্) কলম (কলোম্) জননী (জনোনি) ধরনী (ধরোনি) সরণী (সরোনি) বনবাসী-বনোবাসি, বনমালী-বনোমালি, বনস্পতি-বনোশ্পোতি ইত্যাদি।

শব্দ স্বাভাবিকভাবে বলার জন্য সঠিক উচ্চারণ জরুরি। 'কঅবি' কষ্টদায়ক উচ্চারণ কিন্তু 'কোবি' উচ্চারণটি কী আরামদায়ক! অশুদ্ধ উচ্চারণ শুধু লজ্জা নয় মুখকেও কষ্ট দেয়। মাত্র কিছু নিয়ম জানার মাধ্যমে শুদ্ধ উচ্চারণ সম্ভব।

যেমন হবে সফলকাম হওয়ার প্রস্তুতি

সারাবিশ্বেই মানুষের মধ্যে উৎকর্ষতা অর্জনের প্রতিযোগিতা চলছে। কোন না কোনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় যুক্ত। তাহলে সফলকাম হওয়ার চেষ্টাওতো ঠিকঠাক করা দরকার। এরজন্য প্রয়োজন সঠিক প্রস্তুতি।
বিস্তারিত লিখেছেন, **সৈয়দ মাহাবুব হাসান, অতিরিক্ত সচিব (অব.), প্রাক্তণ পরিচালক এ্যাডমিশন, ইইউবি।**

নিজেই নিজেকে একটা প্রশ্ন করা যাক- *কেমন ছাত্র হতে চাই?* এই প্রশ্নের উত্তর একজন শিক্ষার্থীর নিজের কাছেই আছে। বলা যেতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে উচ্চস্তর অধ্যায়নের প্রথম সোপান। কিন্তু এখান থেকেই একজন শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কেউ হতে চায় চাকরিজীবী আবার কেউ হতে চায় ব্যবসায়ী-সব কিছুর আগে ভালো মানুষ আর সচেতন নাগরিক হওয়ার শিক্ষা ও প্রস্তুতি যে কোন পেশায় একজন মানুষকে সফল করে তুলতে পারে।

১. প্রথমত ক্লাস মিস করা যাবে না
আমি নিজে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কখনো কোন ক্লাস মিস করেছি বলে মনে পড়ে না। দু:খ হয় যখন দেখি একজন শিক্ষার্থী সামান্য অজুহাতে ক্লাস মিস করে। আর এই বিষয় নিয়ে অনেকে বাহাদুরিও করে থাকে। এটা আর কিছু নয়, নিজেই নিজেকে প্রতারণার মাধ্যমে দূর্বল করে তোলা।

২. লং হ্যান্ডে শিক্ষকদের লেকচার লিখে রাখার প্র্যাকটিস থাকা
কোন অবস্থাতেই ক্লাস মিস করা যাবে না, বরং লং হ্যান্ডে শিক্ষকদের লেকচার লিখে রাখার প্র্যাকটিস থাকা প্রয়োজন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একজন শিক্ষক যখন ক্লাস নিতে আসেন, তিনি তৈরি হয়েই আসেন। লেকচার লিখে রাখার পাশাপাশি মডিউল এবং সিলেবাস রেফারেন্স সম্পর্কে একজন শিক্ষার্থীকে আপডেট থাকতে হবে।

৩. প্রযুক্তির বাইরে থাকা নয়, বরং সঠিক ব্যবহার করতে হবে

শিক্ষাজীবনে রেফারেন্স বইয়ের জন্য অনেক কঠিন সময় ব্যয় করেছি। আমাদের সময়ে ঢাকা নিউমার্কেট থেকে অ্যাডভান্স টাকা পরিশোধ করে বই পাওয়া ছিল সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় সাপেক্ষ। আজকাল ইন্টারনেটের সুবাদে অনেক বই ঘরে বসেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ইন্টারনেট মানে গার্বেজ ইন, গার্বেজ আউট। ইন্টারনেটকে কোন দিকে ব্যবহার করবে সেটা একজন শিক্ষার্থীকে ঠিক করে নিতে হবে।

৪. পড়ার জন্য দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে

সফলতা অর্জনের জন্য নিয়মানুবর্তিতা এবং রেগুলারিটির কোন বিকল্প নেই। যার যার পছন্দমত ও সুবিধামত সময় পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া যেতে পারে।

৫. শুদ্ধ করে ইংরেজি লেখার অভ্যাস রপ্ত করা : শুদ্ধ করে ইংরেজি লিখতে পারার দক্ষতা একজন শিক্ষার্থীর জন্য বিশাল সম্পদ। বলার সময় ভুল হলে খুব অপরাধ নয়। কেননা, বলা কথা বাতাসে মিলিয়ে যায়। কিন্তু লেখাটা দালিলিক। এটি ভুল হওয়া মানে লেখকের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া। আমাদের দেশে একজন শিক্ষার্থী প্রায় শিশুকাল থেকেই ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ শুরু করে। তারপর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পার করে এসে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও অনেকে কেন শুদ্ধ করে ইংরেজি লিখতে পারে না, তা আমার কাছে বিস্ময়। মনে রাখতে হবে ইংরেজি এখন শুধুমাত্র ইংরেজদের ভাষা নয় এটি এখন সারা বিশ্বের ভাষা, ইন্টারনেটের ভাষা। তাছাড়া ইংরেজি হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল সমুদ্রে প্রবেশের দরজা। একজন শিক্ষার্থীর জন্য শুদ্ধ ইংরেজি শিক্ষার সহজ উপায় হতে পারে, যারা ইংরেজি জানেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, গ্রুপ স্টাডি করা, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। অনলাইনেও ছোট-বড় অনেক কোর্স রয়েছে সেগুলোর সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. সীমানা পেরোনোর প্রস্তুতি

প্রতিযোগিতার এই সময়ে নিজেকে উন্নত স্তরে নিতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে হবে। দেশের বাইরে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী গ্রহণ করতে চাইলে - জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে আছে যেসব দেশ সেসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে টার্গেট করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। যদিও এই জার্নিটা কঠিন কিন্তু সফলকাম হলে পুরস্কার আসবে অবারিত।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা: স্বপ্ন,বাস্তবতা ও কিছু পরামর্শ

বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্নে অনেক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীই বিভোর থাকে। সঠিক দিকনির্দেশনা তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহয়ক হবে বলেই এই আয়োজন। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পুরোটা জার্নি সহজ করে দেবে এমন পরামর্শ দিয়েছেন- **মো. এজাজুর রহমান, সিনিয়র লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেসন, ই.ইউ.বি। তাসনিম জাহান টুম্পা, লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক্স, ই.ইউ.বি।**

প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমায়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের গন্তব্য হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড

এবং আয়ারল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। নেটিভ ইংলিশ স্পোকেন দেশ হওয়ার সুবাদে এ দেশগুলোতে শিক্ষার্থীদের গমনের হার অবধারিতভাবেই কিছুটা বেশি।

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে- জার্মানি, নেদারল্যাণ্ডস, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। এসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে। এছাড়া উন্নত জীবনযাত্রার মানের পাশাপাশি সুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়ার সুবাদে এদেশগুলো শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় প্রায়ই স্থান করে নেয়।

ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার পেছনে অবদান রাখে সেসব দেশের হেরিটেজ, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক নানা সুবিধা।

বর্তমানে দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া। এসব দেশ সফট্ পাওয়ার বৃদ্ধি করার জন্য বিদেশী শিক্ষার্থীদের ক্রমাগত স্বাগত জানাচ্ছে।

বলা হয়ে থাকে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে যুক্তরাজ্য, যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং সম্প্রতি এশিয়া 'ইউনিভার্সিটি পাওয়ার হাউস' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

সাম্প্রতিক গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্রমউন্নতি তারই বহি:প্রকাশ।

এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি হওয়ার পাশাপাশি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে উন্নত গবেষণার সুযোগ। আরও আছে শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থা।

তবে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানের যেমন তারতম্য আছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে অর্জিত সার্টিফিকেটের গ্রহনযোগ্যতারও ভিন্নতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের গন্তব্য হিসেবে নির্বাচন করতে হলে কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

স্কলারশিপ
টিউশন ফি
গবেষণাখাতে বরাদ্দ অনুদান বা ফাণ্ড
ভাষাগত জটিলতা
শিক্ষাপরবর্তী কর্মসংস্থানের সুযোগ
সাংস্কৃতিক বৈষম্য, এবং
আবহাওয়ার পার্থক্য

এসব বিষয় বিবেচনায় এনে দেশের বাইরে পড়ার গন্তব্য বাছাই করা উচিত। এছাড়া, নিজের তথ্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে এবং পছন্দের প্রোগ্রাম ও গন্তব্য সম্পর্কে অবগত হতে হবে। কথায় আছে, 'থিঙ্ক টোয়াইচ অ্যান্ড অ্যাক্ট ওয়াইজ'।

গন্তব্যে পৌঁছাতে সহায়ক তথ্য

১. কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংস অথবা টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংস খেয়াল করা যেতে পারে। র‍্যাংকিংগুলোর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে একজন শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য খুঁজে পেতে পারেন।

২. পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ দিয়ে থাকে ফল সেমিস্টারে। আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্প্রিং সেমিস্টারেও বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি নেয়। তবে ফল সেমিস্টারে শিক্ষার্থীদের এনরোলমেন্ট সবচেয়ে বেশি কারণ এই সেমিস্টারে স্কলারশিপ এবং ফান্ডিংয়ের আধিক্য বেশি থাকে। এই সুযোগ পেতে হলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইট থেকে আবেদনের সাধারণ ডেডলাইন এবং প্রায়োরিটি ডেডলাইন জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী প্রস্তুতি শুরু করা যেতে পারে।

৩. বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অফার করা একাডেমিক প্রোগ্রামগুলো এবং এসব প্রোগ্রামে ভর্তি যোগ্যতার যাবতীয় তথ্যাদি সঠিকভাবে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইট হবে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

৪. স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট প্রোগ্রামে ভর্তি যোগ্যতার মানদণ্ড পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্নভাবে নির্ধারণ করে থাকে। তবে বিশ্বব্যাপী অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্ট্রি এক্সাম হিসেবে স্যাট, এলস্যাট, জিআরই, জিম্যাট ইত্যাদি স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্টে ভাল স্কোর চেয়ে থাকে। বাংলাদেশে থেকেই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট টেস্ট সেন্টারে এই অনলাইন ভিত্তিক টেস্টগুলো দেওয়া যেতে পারে।

৫. ইংরেজি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইইএলটিএস, টোফেল, পিটিই ইত্যাদিতে স্ট্যান্ডার্ড স্কোর চেয়ে থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও এই কোর্সগুলোর সঙ্গে কম-বেশি পরিচিত। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, চাইনিজ বা রাশিয়ান ভাষার একাডেমিক দক্ষতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত নির্ভরযোগ্য ভাষাশিক্ষা বিষয়ক সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যেতে পারে- এই দক্ষতা এইসব ভাষায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

৬. বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রোগ্রামে ভর্তি যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য অনেক সময় এসওপি, লেটার অব রিকমেন্ডেশন এবং রিসার্চ ইন্টারেস্ট চাওয়া হয়। এসওপি মানে হলো স্টেটমেন্ট অব পারপাস অর্থাৎ যে প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করেছে সে প্রোগ্রাম পড়ার কারণ, আবেদনকৃত প্রোগ্রাম কীভাবে তাদের সাহায্য করবে কিংবা এ প্রোগ্রাম থেকে অর্জিত জ্ঞান কীভাবে তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে অবদান রাখতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত একটি ডকুমেন্ট। আর লেটার অব রিকমেন্ডেশন হলো এমন ব্যক্তিদের হতে প্রাপ্ত সুপারিশপত্র যারা কিনা শিক্ষার্থীদের মেধা ও পেশাগত দক্ষতা এবং ব্যক্তিগত বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা রাখে। অন্যদিকে রিসার্চ ইন্টারেস্ট হল শিক্ষার্থীদের গবেষণার বিষয়বস্তু, গবেষণার প্রক্রিয়া এবং গবেষণার নতুনত্বের বিষয়ে সুসংগঠিতভাবে লিখিত একটি প্রস্তাবনা পত্র। ভর্তি প্রতিযোগিতায় অসাধারণ এসওপি, লেটার অব রিকমেন্ডেশন এবং রিসার্চ ইন্টারেস্ট একজন শিক্ষার্থীকে অন্যদের চেয়ে বিশেষভাবে এডমিশন কমিটির নিকট উপস্থাপন করে। আর তাই এই ডকুমেন্টগুলো প্রস্তুতকালে অনেক বেশি যত্নবান হওয়া উচিত।

৭. কমনওয়েলথ, শিভেনিং, ফুলব্রাইট, দাদ, এরাসমাস মুন্ডুস ইত্যাদি স্কলারশিপের জন্য বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এছাড়াও বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেস্ব স্কলারশিপ এবং ফান্ডিংয়ের নানাবিধ স্কীম চালু রয়েছে যা শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগে খুঁজে নিতে পারে। এমনকি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আরও বেশি স্কলারশিপ চালু রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক হতে পারে scholar4dev.com ওয়েবসাইটি।

৮. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টিউশন ফি এবং পড়ালেখা চলাকালীন জীবনযাত্রার খরচ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট। তাছাড়া স্টুডেন্ট লোন, এবং অধ্যায়নরত অবস্থায় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন খণ্ডকালীন চাকরির সুযোগ সংক্রান্ত তথ্যাদিও ওয়েবসাইটগুলোতে থাকে।

৯. পড়ালেখা চলাকালীন টিউশন ফি ওয়েভার এবং জীবনযাত্রার খরচ নির্বাহের আরেকটি অন্যতম মাধ্যম হল রিসার্চ এ্যাসিসট্যান্টশিপ অথবা টিচিং এ্যাসিসট্যান্টশিপ ব্যবস্থা করা। সাধারণত স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট প্রোগ্রামগুলোতে নিজ নিজ বিভাগের স্বনামধন্য প্রফেসরদের সুপারিশে এই সুবিধাগুলো শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে। তার জন্য গবেষণার বিষয় নিয়ে নিজেরে অর্জিত অভিজ্ঞতা বা প্রকাশিত কোন গবেষণা প্রবন্ধ প্রফেসরদের রিসার্চ ইন্টারেস্টের সাথে মিলে কিনা তা খুঁজে বের করে তাদের সঙ্গে যথা সময়ে যোগাযোগ করতে হয়।

১০. বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হলো নিজের মধ্যে গ্লোবাল মাইন্ডসেট ধারণ করা। সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি, উদারতা এবং বৈচিত্রতা নিজের চিন্তাভাবনায় লালন করলে একটি মাল্টিকালচারাল সোসাইটিতে কিংবা যেকোন বিদেশী সংস্কৃতিতে সেখানকার মানুষের সঙ্গে সহজে মানিয়ে নেওয়া যায়। একটি কথা সব সময় মনে রাখা উচিত- 'হোয়েন ইউ আর ইন রোম, এক্ট লাইক এ রোমান'।

(নিজগুণ, মেধা, পরিশ্রম, পরামর্শ দিয়ে কোন কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনের উচ্চাসনে জায়গা করে নিতে পারেন। ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের লেখায় উঠে এসেছে এমন কিছু গল্প যে গল্পগুলোর কেন্দ্রে একজন শিক্ষক।)

আমার প্রিয় শিক্ষক : জীবনের মূল্যবান পাঠ

নাম: তাহমিনা নাসিম নিশা,
ডিপার্টমেন্ট : ইংলিশ, আইডি নাম্বার : ১৯০১০৫০০৬

আমার প্রিয় শিক্ষক

এই পৃথিবীতে পিতামাতার বদৌলতে সন্তান জন্ম লাভ করে ঠিকই কিন্তু সেই সন্তানের জীবনকে সার্থক এবং সফল করে তোলার পেছনে যার সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে তিনি হলেন শিক্ষক। শিক্ষকের পদপ্রান্তে বসে আমরা গ্রহণ করি জীবনের মূল্যবান পাঠ। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুঁথিগত শিক্ষা, জীবন হতে শিক্ষা, জীবনকে সফল ও সার্থক করে গড়ে তোলা, একজন আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠা প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিটি শিক্ষক/শিক্ষিকার অবদান রয়েছে । তবু প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু বিশেষ কারণে এক বা একাধিক শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রিয় হয়ে ওঠেন। আমার জীবনেও এমন একজন প্রিয় শিক্ষক রয়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে কলেজ জীবন পর্যন্ত অনেক শিক্ষকের সাহচর্য পেয়েছি। তাদের সকলের কাছেই আমি সঞ্চয় করেছি অনন্ত জীবনের পথ চলার পাথেয়। আমার প্রিয় শিক্ষকের নাম হল হাসিনা বেগম। কিছু বিশেষ কারণে তিনি আমার মনে ধ্রুবতারার মত জেগে আছেন। তিনি হচ্ছেন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমি ' বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা । আমি জানি তিনি কোন দেশ বিখ্যাত ব্যক্তি নন, তবে আমার মত হাজারো শিক্ষার্থীর মনে তিনি জায়গা করে আছেন । তিনি আমাদের সমাজ

ক্লাস নিতেন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়ার পাশাপশি ছিলেন খুবই ভালো মানুষ। তিনি আমাদেরকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। সেই সাথে মেয়েদেরকে কীভাবে এবং কেন নিজের পায়ে দাড়াতে হবে, নিজের আত্ম সম্মানবোধ বজায় রাখতে হবে এসব সম্পর্কে খুব সুন্দরভাবে বুঝাতেন। আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হওয়ায় জীবনে নানা ধরনের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। পড়াশোনার খরচ চালানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়েছে আমাকে। কিন্তু আজ আমি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ' থেকে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক করছি। এসবই সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র হাসিনা ম্যামের কারণে। মহান আল্লাহর পর তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমার সাহস জুগিয়েছেন, জীবনের আসল অর্থ বুঝিয়েছেন, মেয়ে হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মর্ম বুঝিয়েছেন পরিশেষে একজন আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে সাহয্য করেছেন। আজ আমি একজন শিক্ষার্থী হওয়ার পাশাপাশি একজন ছোট খাটো শিক্ষক। নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতে ও পরিবারের হাল ধরতে এ পেশায় নিয়োজিত হলেও আমার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার সাথে একজন আদর্শ শিক্ষক হয়ে গড়ে ওঠা । তাঁর আদর্শ ধরেই আজ আমি এতদূর আসতে সক্ষম হয়েছি। আশা করি জীবনের লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারব।
একজন শিক্ষক 'আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর' যা সত্যিই তিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি আজও আমার মনে গেঁথে আছেন এবং চিরদিন আমার জীবনকালে আদর্শ মূর্ত প্রতিক হয়ে থাকবেন।

আমার প্রিয় শিক্ষক : জীবন গঠন প্রক্রিয়ায় সবসময় ক্রিয়াশীল

নাম : সুবা চাকমা, ডিপার্টমেন্ট : ইংলিশ, আইডি নাম্বার : ১৯০১০৫০১৯

আমার শিক্ষা জীবনের বেশ ক'জন প্রিয় মানুষ গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাদের মধ্যে আমার প্রিয় শিক্ষক জনাব সিরাজ উদ্দিন স্যারের নাম আমার কাছে রাতের আকাশে ধ্রুবতারা মতোই উজ্জ্বল একটি নাম। তার নীতি–নির্দেশেনা, চিন্তা–চেতনা জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি আমার জীবন গঠন প্রক্রিয়ায় সবসময় ক্রিয়াশীল রয়েছে। আমি তখন প্রথম শ্রেণির ছাত্র, বাবার কোলে চড়ে প্রথম যেদিন দিঘীনালা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি হই সেদিনই প্রথম সিরাজ উদ্দিন স্যারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।
বাবার কোল ছেড়ে শিক্ষকের কোলে আশ্রয় পেলাম, শিক্ষকের হাত ধরলাম। সেদিন যে নির্ভরতা তৈরি হয়েছিল তা যেন আজও অটুট। সেই নির্ভরতা আজও আমার জীবনপথের পাথেয়। সিরাজ উদ্দিন স্যার শুধু আমার প্রিয় শিক্ষকই নন তিনি আদর্শও। কেননা তিনি সুন্দরের উপাসক, সৎ ও আদর্শ ব্যক্তি।

আমার প্রিয় শিক্ষক : সুপ্ত প্রতিভার আবিষ্কারক
শাহ মো. আলী জাহাঙ্গীর মেরাজঃ ডিপার্টমেন্টঃ আইপিই, প্রথম ব্যাচ

একজন আদর্শ শিক্ষক একজন ছাত্রের জীবনে এবং একটি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবান সম্পদ। তিনি একাধারে জাতির নির্মাতা, ছাত্রদের বন্ধু, দার্শনিক এবং পথ-প্রদর্শক। একজন আদর্শ শিক্ষক ছাত্রের সুপ্ত প্রতিভার আবিষ্কারক।

প্রাচীনকালে গ্রীসদেশীয় শিক্ষকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করতেন। স্বাধীন মতবাদ ও স্বকীয় চিন্তা ধারায় তারা শিক্ষাদান করতেন। তারা ছাত্রদের চরিত্র গঠনে প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন।
আজকের সমাজে ভালো শিক্ষক পাওয়া দুষ্কর। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা এখন বাজারের পণ্য, তবুও শিক্ষক সেখানে বিদ্যার ফেরিওয়ালা।
এ যুগেও যিনি প্রকৃত আদর্শ শিক্ষক, তিনি ছাত্রের মনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। আমি সৌভাগ্যবান যে আমার এ ক্ষুদ্র শিক্ষাজীবনে বেশ কজন ভালো শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পেরেছি। উনারা গভীরভাবে আমার মনে প্রভাব বিস্তার করেছেন। সকল শিক্ষকের প্রতিই আমি শ্রদ্ধাশীল। মাত্র একজন শিক্ষককে বাছাই করা আসলেই কঠিন। তবে আমার জীবনে যে সকল শিক্ষকের আদর্শ ও শিক্ষা খুব গভীরভাবে ছাপ ফেলেছে তাদের মাঝে অন্যতম হলেন নুরুল ইসলাম রাজু স্যার। উনি ছিলেন ছাত্র দের প্রতি সর্বদা আন্তরিক এবং সবাইকে সাহায্য করতে উৎসাহী। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন সৎ চরিত্রের সহজ-সরল জীবনে বিশ্বাসী মানুষ। যাকে দেখে ছাত্ররা নীতিবান হতে উৎসাহী হতো। তার নীতি নির্দেশনা, চিন্তা চেতনা, জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি আমার জীবন গঠন প্রক্রিয়ায় সব সময়ই ক্রিয়াশীল রয়েছে। স্যারের সম্পর্কে লিখতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে। তাই খুবই সংক্ষিপ্ত করে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র।
আমাদের জীবনে শিক্ষকের গুরুত্ব বাবা-মায়ের থেকে কোন অংশে কম নয়। বাবা-মা আমাদের দুনিয়াতে নিয়ে আসেন। কিন্তু শিক্ষক আমাদের বৃহত্তর সমাজের সাথে পরিচিত করান। শিক্ষকের প্রতি সম্মান করা তাই আমাদের অবশ্যকর্তব্য। সমাজে শিক্ষককে উচ্চাসন দিলে সমাজের তথা জাতির জন্য মঙ্গলজনক।

আমার প্রিয় শিক্ষক : সুনাগরিক হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেন

নাম : জাহান নুপুর, ডিপার্টমেন্ট : ইংলিশ, আইডি নাম্বার : ১৯০১০৫০১৮

আমার কাছে প্রিয় শিক্ষক বা শিক্ষিকার মধ্যে যে মানুষটি রয়েছেন, তিনি এক কথায় একজন ভালো শিক্ষক একজন ভাল বন্ধু। তার সাথে আমি এবং আমার সহপাঠীরা যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে চলাচল করি। তিনি আমাদের ইংরেজি বিভাগের একজন শিক্ষিকা সালমা নাসিমা নূর। তিনি আমাদের তার সন্তানের মতো আদর, ভালবাসা, স্নেহ, সাহায্য, শাসনের মাধ্যমে সুনাগরিক হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেন। এসব অসাধারণ গুনাবলির কারণে তিনি একজন আর্দশ এবং আমার প্রিয় শিক্ষক।

“Of all the hard jobs around, one of the hardest is being good teacher”

আমার প্রিয় শিক্ষক: মহৎ চরিত্রের অধিকারী

নাম : সাইফুল ইসলাম, ডিপার্টমেন্ট : ইংলিশ, আইডি নাম্বার : ১৯০১০৫০১৭

শিক্ষকরা হলেন আমাদের পথ প্রদর্শক দার্শনিক এবং বন্ধু। আমি আমার সকল শিক্ষককে পছন্দ করি এবং সম্মান করি। প্রত্যেক শিক্ষক এবং শিক্ষিকার প্রতি সম্মান রেখে একজনকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করছি। আমার প্রিয় শিক্ষিকা হচ্ছেন ‘‘রিঙ্কু সাহা” যিনি আমাদের ইংরেজি পড়ান। কেন আমি তাকে অধিক পছন্দ করি: তার মহৎ চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করে এছাড়া তার কথা বলার কৌশল এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি অসাধারণ। তার মতো একজন শিক্ষিকা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য গর্ব ।

আমার প্রিয় শিক্ষক : চিন্তাধারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন

নাম : কোলোবাসি চাকমা, ডিপার্টমেন্ট : ইংলিশ, আইডি নাম্বার : ১৯০১০৫০২০

শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অসাধারণ অনেক ভালো সম্পর্কে বলতে হয় তাহলে একজন শিক্ষকের কথাই আমি বলব। যিনি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের চলার পথে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়েছেন। আমার সেই প্রিয় শিক্ষকের নাম শোভাকর। শ্রদ্ধেয় শোভাকর স্যার ছিলেন আমার স্কুল শিক্ষক। আমি তখন সপ্তম শ্রেনির ছাত্র ছিলাম। শোভাকর স্যার আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। ইংরেজি আমার কাছে খুবই কঠিন একটি বিষয় মনে হতো। এই ইংরেজি ভীতি দূর হয় শোভাকর স্যারের পাঠদানের কারণেই। স্যারের যে দিকটি আমার সবচেয়ে ভালো লাগত তা হলো তিনি শুধু ক্লাস পাঠদানের মধ্যেই জ্ঞান বিতরণ সীমাবদ্ধ রাখতেন না। তিনি পাঠ্যবইয়ের বাইরে ও শিক্ষার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করতেন। ক্লাসের পুরাটা সময় তিনি জ্ঞানের আলোয় মাতিয়ে রাখতেন ছাত্রদের। স্যারের পাঠদান এবং সুচিন্তিত আলোচনার প্রতি আমার প্রচন্ড আগ্রহ জেগে ওঠে। তখন থেকেই আমি প্রচুর বই পড়ি এবং যার ফলে আমার ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও চিন্তাভাবনায় অনেক পরিবর্তন আনে। স্যারের কথাগুলো আজও খুব মনে পড়ে । তিনি একটা কথা প্রায়ই খুব গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে বলতেন তা হলো, স্রষ্টা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অপিরিমেয় শক্তি দিয়ে। দৃঢ় সংকল্প, পরিশ্রম আর অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। স্যারের এই উপদেশ এবং তার আদর্শ অনুসরণ করেই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি রচিত হচ্ছে। তার চলা ও তার বলার ভঙ্গি, তার আচরণ, তার উন্নত ও মহৎ চরিত্র আমার আদর্শ ও অনুকরণীয়। আমি সৌভাগ্যবান যে শোভাকর স্যারের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে পেরেছি ।

আমার প্রিয় শিক্ষক : নতুন কিছু শিখতে উৎসাহিত করেন

নাম : শাকিল আহমেদ, ডিপার্টমেন্ট : ইংলিশ, আইডি নাম্বার : ১৯০১০৫০৪৫

শিক্ষকরা হলেন জাতি গড়ার স্থপতি। শিক্ষক হলেন দেশের সম্পদ। আমার ছাত্র জীবনে আমি অনেক শিক্ষকের দেখা পেয়ে আসছি। তাদের মধ্যে শরিফ আহমেদ আমার প্রিয় শিক্ষক। তিনি খুবই সৎ, আন্তরিক এবং সময়নিষ্ঠ। তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞান সমৃদ্ধ একজন পন্ডিত ব্যক্তি। তার শিক্ষাদান পদ্ধতি খুবই সহজ এবং আকর্ষণীয়। তিনি পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট সাহায্যে করেন। তার বিশেষ গুণাবলী আছে যা আমাদের দারুণভাবে আকর্ষণ করে। নতুন জিনিস শিখতে তিনি সর্বদা আমাদের উৎসাহিত করেন। তার মধ্যে এ ভিন্ন গুনাবলি থাকার কারনে তিনি আমার প্রিয় শিক্ষক। আমি মনে করি তিনি একজন বাবা, ভাই এবং ঘনিষ্ট বন্ধু।

আমার প্রিয় শিক্ষক : সুশৃঙ্খল একজন মানুষ

নাম : শাকিল জিমিত জিমিত চাকমা, ডিপার্টমেন্ট : ইংলিশ, আইডি নাম্বার : ১৯০১০৫০৪৭

শিক্ষক মানেই সকল ছাত্র-ছাত্রীর কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। ছাত্রজীবনে যার সান্নিধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় কাটে, তিনি হলেন শিক্ষক। আমি একজন ছাত্র। বহু শিক্ষকের কাছে সাহায্যের জন্য আমাকে যেতে হয়েছে। তাদের সুন্দর দীক্ষায় আমার জ্ঞানচক্ষুর আঁধার কেটে গেছে। তাদের মধ্যে কে কে যে প্রিয় শিক্ষক, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা খুবই কষ্টকর। আমি মনে করি আমার বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগে সেরা একজন শিক্ষিকা পেয়েছি। তিনি হলেন আমাদের প্রিয় রহিমা আক্তার ম্যাম তার প্রতিভার জন্য আমি তাকে শ্রদ্ধা করি এবং প্রশংসা করি । তার শিক্ষাদান পদ্ধতি, স্নেহ পরায়নতা এবং নম্র ব্যবহার আমাদের সবাইকে আকর্ষণ করে। সার্বিক বিচারে তিনিই আমার প্রিয়

শিক্ষক। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সঠিক শিক্ষাদানই তার আসল উদ্দেশ্য। তার স্পষ্ট উচ্চারণ এবং নিখুঁত হাতের লেখা আমাদেরকে পড়ার দিকে আকৃষ্ট করে, মনোযোগ দিতে সাহায্য করে। নানা রকম কঠিন বিষয় উদাহরণ ও সরল আলোচনার মাধ্যমে তিনি সহজভাবে বুঝিয়ে দেন। তার ক্লাসে সবসময় শৃঙ্খলা বিরাজ করে। এই রকম শিক্ষক পাওয়া আমার জন্য সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।

আমার প্রিয় শিক্ষকঃ নীতিবান

নামঃ তামজিদ আহমেদ, ডিপার্টমেন্ট : ইংলিশ, আইডি নাম্বার : ১৯০১০৫০৪৪

আমি সৌভাগ্যবান যে আমার শিক্ষাজীবনে বেশ কিছু ভালো শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পেরেছি। সকল শিক্ষকের প্রতিই আমি শ্রদ্ধাশীল। মাত্র একজন শিক্ষককে বাছাই করা আসলেই কঠিন ব্যাপার। তবে আমার জীবনে যে সকল শিক্ষকের আদর্শ ও শিক্ষা খুব গভীরভাবে ছাপ ফেলেছে তাদের মাঝে অন্যতম হলেন শীতল স্যার। শ্রী শীতল চন্দ্রদে স্যার নটরডেম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। উনি ছিলেন ছাত্রদের প্রতি সর্বদা আন্তরিক এবং সাহায্য করতে উৎসাহী । গণিতের শিক্ষক হিসেবে উনি আসলেই অতুলনীয়। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন সৎ চরিত্রের সহজ সরল জীবনে বিশ্বাসী মানুষ।

স্যার তার ছাত্রদেরকে খুব সহজে বোঝাতে পারতেন যা একজন আদর্শ শিক্ষকের অন্যতম গুনাবলী, হিসাববিজ্ঞানের মতো একটি বিষয়ও স্যার আমাদেরকে এতো উৎসাহ এবং দক্ষতা নিয়ে পড়িয়েছেন যে সকল ছাত্রই তার কাছে চিরমুগ্ধ থাকবে। স্যারের সুদীর্ঘ সময়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ছিল। উনি এমন একজন শিক্ষক যিনি সকলের মন জয় করতে পেরেছিলেন।

আমার প্রিয় শিক্ষকঃ খুবই দায়িত্বশীল

নামঃ মুনমুন আক্তার, ডিপার্টমেন্টঃ ইংলিশ, আইডি নাম্বারঃ ১৯০১০৫০১২

আমরা যা শিখি, যতটা জানি তার অধিকাংশ শিখায় আমাদের শিক্ষকরা। সফলতার পিছনে থাকে শিক্ষকের অবদান। যাদের ওপর ভর করে মাথা তুলে দাঁড়াই আমরা । শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, শিক্ষকদের থেকে যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা অর্জন করি তা জীবনের বাকি দিনগুলোতে বহন করে থাকি আমরা। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কখনও আলাদাভাবে যাচাই করা যায় না। আমার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা আমার কাছে প্রিয় । তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার একজন প্রিয় শিক্ষিকা সম্পর্কে লিখতে চাই । আমার প্রিয় শিক্ষিকা শ্রদ্ধেয় ওয়াহিদা রহমান ম্যাডাম। প্রায়সই পড়ার বাইরে ও তিনি আমাদের মজার কথা বলে আনন্দ দেন। তিনি খুবই দায়িত্বশীল। তার উপদেশ এবং শিক্ষাদান দক্ষতা খুব ভালো। তিনি খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ মানসিকতার। তিনি খবই যত্নশীল কারণ তার ক্লাসে আমি আলাদা অভিজ্ঞতা পেয়েছি। তিনি আমার পড়ার সকল সমস্যা সমাধান করে দেন। তিনি শালীন এবং সহিষ্ণু। আমি তার ক্লাস খুবই উপভোগ করি। বিশ্বের কাছে তিনি কেবল একজন শিক্ষিকা হতে পারেন তবে আমার কাছে তিনি একজন আদর্শ শিক্ষিকা। তিনি খুবই ভালো একজন শিক্ষিকা। আমি সর্বদা তাকে অনেক শ্রদ্ধা ও সম্মান করি।

আমার প্রিয় শিক্ষক : দয়ালু ও আধুনিক

রিসেন চাকমা , ডিপার্টমেন্টঃ ইংলিশ, আইডি নাম্বার : ১৯০১০৫০০৩

আমার নাম রিসেন চাকমা এবং আমি ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়-এর একজন ছাত্র। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এখানে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষকার সংখ্যা অনেক। আমারও একজন প্রিয় শিক্ষিকা আছেন। তিনি খুবই ভদ্র, ক্ষমাশীল, দয়ালু ও আধুনিক। তিনি আমাদের অনেক ভালোবাসেন আর স্নেহ করেন। তিনি কখনও ক্লাস দেরি করে আসেন না আর ক্লাস কখনও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করেন না। তিনি ক্লাসে অত্যন্ত ভালো পড়ান, তার পড়ানোর ধরনটা অনেকটা আলাদা, যখন তিনি পড়ান তখন আমার অনেক ভালোলাগে মন থেকে অলসতা ভাব চলে যায়, আর পড়ার প্রতি অনেক আগ্রহ জাগে। তিনি খুবই ক্ষমাপরায়ণ আমরা যদি ক্লাসে কোনও সময় ভুলও করে থাকি তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেন । তিনি আর কেউ নন তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় শিক্ষিকা সালমা নাসিমা নূর স্বর্না ম্যাডাম আমরা তাকে স্বর্না বলে বেশি চিনি। আর তিনিই হচ্ছেন আমার প্রিয় শিক্ষিকা। তার সব থেকে ভালো দিক হচ্ছে তিনি ক্লাসে বিষয়ের বাইরেও অনেক বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেন।

আমার প্রিয় শিক্ষক

নিটন চাকমা, ডিপার্টমেন্টঃ ইংলিশ, আইডি নাম্বারঃ১৯০১০৫০৩১

আমি সৌভাগ্যবান যে আমার শিক্ষাজীবনে বেশ কিছু ভালো শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পেরেছি। সকল শিক্ষকের প্রতিই আমি শ্রদ্ধাশীল। তাদের থেকে একজন শিক্ষককে বাছাই করা আসলেই কঠিন । তবে আমার জীবনে যে সকল শিক্ষকের আর্দশ ও শিক্ষা খুব গভীর ভাবে ছাপ ফেলেছে তাদের মাঝে অন্যতম হলেন মো: ইদ্রিস স্যার । তিনি মাটিরাঙ্গা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে গনিত বিষয়ের শিক্ষক। তিনি ছিলেন সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করতে উৎসাহী। গনিতের শিক্ষক হিসাবে তিনি আসলেই অতুলনীয়। গনিতের মতো কঠিন বিষয়, যা অনেকের কাছেই আতঙ্কের, এমন একটি বিষয় হলেও স্যার আমাদেরকে এতো উৎসাহ এবং দক্ষতা নিয়ে পড়িয়েছেন যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা তার কাছে চিরঋণী। স্যারের সুদীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা ছিল। অন্যান্যদের চেয়ে তার পড়ানোর কৌশলটা ছিল ভিন্ন এবং আর্কষণীয় । গল্পের ভঙ্গিতে তার এ পাঠদানের ভঙ্গিটাই ক্রমে আমার মন জয় করে নিল। তিনি হয়ে উঠলেন আমার সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক এবং তিরি আমার শিক্ষাজীবনের অপরিসীম প্রেরণার উৎস।

[কবিতা]

বৃক্ষ

মো. মোস্তফা কামাল: আইডি: ১৯০১০৩০১২: এমবিএ

বিন্দু ছিলে সেই অনেক আগেই
তার পরে অন্ধকারে
মাটির ছোঁয়া পেয়ে
উঠলে যে গান গেয়ে
আস্তে আস্তে ছেঁয়ে
সব কিছু যে ধেয়ে।

আশ্রয় দিলে সব জাতিকে যুগ যুগ ধরে
শোভাতে ভরালে কাছে ও দূরে

কে এমন পারে পাতা ফুলে ফলে
পৃথিবী সাজাতে...

দায়ে পড়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করলে দায়বোধ জাগা কঠিন : যতীন সরকার

প্রগতিশীল চিন্তাশীল ও লেখক অধ্যাপক যতীন সরকার। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন। কথায় কথায় উঠে এসেছে শিক্ষকের প্রকৃত কাজের ধরণ, জীবিকা হিসেবে শিক্ষকতা কেমন এই সবই।
কথোপকথনে: স্বরলিপি

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই-

যতীন সরকার: অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যানুপাতিক ভারসাম্য রক্ষিত হচ্ছে না। তখন সমস্ত চৈতন্যে নৈরাশ্য এসে ভর করে। এই নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার আলো যে একেবারেই চোখে পড়ে না, তাও নয়। সর্ব প্রকার কাঠিন্যকে অস্বীকার করে নিয়েই অনেক স্বহৃদয় শিক্ষিত মানুষকে জীবিকার অবলম্বণ হিসেবে শিক্ষকতাকে গ্রহণ করতে দেখি। এইরকম শিক্ষকগণই এই পেশাটিকে এখনও গৌরবান্বিত করে রেখেছেন।

শিক্ষকের প্রকৃত কাজ কী?

যতীন সরকার: সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'এমন একটি কথা পাওয়া যায় বিশুদ্ধ ও সুরসিক লেখক প্রমথ চৌধুরীর লেখায়। কথাটিকে অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। তবুও প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে শিক্ষকদের কাজ কী? স্বশিক্ষিত হয়েই যদি সুশিক্ষিত হতে হয়, তবেতো শিক্ষকের কোন কাজই থাকতে পারে না। এমন প্রশ্নের জবাবে অবশ্যই সকলের জানা, প্রকৃত শিক্ষকের কাজ হলো- শিক্ষার্থীকে স্বশিক্ষিত হওয়ার পথ দেখিয়ে দেওয়া।

শিক্ষকের জীবিকা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য

যতীন সরকারঃ শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া কেউ স্বশিক্ষার পথ খুঁজে পেতে পারে না। আবার সুশিক্ষিতও হয়ে উঠতে পারে না। সে কারণেই সমাজের শিক্ষকরা হন মর্যাদাবান। শিক্ষকরা হন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। শিক্ষকের জীবিকাও তায়। অন্য অনেক জীবিকার চেয়ে মহৎ বলে গণ্য হয়। নিতান্ত দরিদ্র শিক্ষকও অনেক ধনবান মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সম্মান পেয়ে থাকেন। তাই বলে, দরিদ্র শিক্ষকটি দারিদ্রের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হন না? হন। তবুও তারা খুব সহজেই 'হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছো মাহান' বলে, আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারেন।- একথা বোঝার জন্য খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করার দরকার পড়ে না।

অতীতে শিক্ষকতা পেশাকে কেমন দেখেছেন এখন কেমন দেখছেন?

যতীন সরকারঃ তবে হ্যাঁ, আমাদের ছেলেবেলায় শিক্ষকদের যে রকম দরিদ্র দশায় কাল কাটাতে দেখেছি এখন তেমনটি দেখি না। সরকারি উদ্যোগে শিক্ষকদের বেতন আগের চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধি হয়েছে। আগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য অবসর উত্তর পেনশনের ব্যবস্থা ছিল না। এখন আর তেমনটি নেই। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এখন আর চরম দুর্বিপাকে পড়তে হয় না। বেসরকারি বিদ্যালয়- মহাবিদ্যালয়েও শিক্ষকরা অবসর গ্রহণের আগে কিছু নগদ টাকা পেয়ে থাকেন। তবু অন্যপেশার তুলনায় শিক্ষকতার পেশাকে কোনভাবেই লোভনীয় বলা চলে না। কেউই সহজে শিক্ষকতা পেশায় আসতে চান না।

[নিতান্ত দায়ে পড়ে অনেকে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করে থাকেন। দায়ে পড়ে যা গ্রহণ করা হয়, তাতে গ্রহণকারীর মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগা খুবই কঠিন।]

তবে দরিদ্র শিক্ষকের প্রতি সমাজের মানুষ যে সম্মান দেখায় সেই সম্মানের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে করুণা! তাছাড়া, আজও যখন দেখি যে, বেতনের দাবিতে শিক্ষকদের রাস্তায় দাঁড়াতে হয় কিংবা প্রয়োজনীয় ক্লাশরুম, শিক্ষকের অভাবে সঠিকভাবে শিক্ষাকার্ক্রম চলতে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক শিক্ষকই যে প্রকৃত শিক্ষকসূলভ আচরণ করেন না এমনতো হরহামেশায় দেখা যায়। সংবাদপত্রের পাতা খুললেই শিক্ষকদের অনেক অসদাচারণের সংবাদ দেখতে পাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষকের যৌন কেলেঙ্কারির বিবরণ অনেক সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসে। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদ বর্তমানে শিক্ষক ও শিক্ষা সম্পর্কে অনেকের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করেছে। এই রকম বিরূপতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আমাদের খুঁজে নিতেই হবে।

একজন শিক্ষানুরাগীঃ আবদুল গণি মিয়া

আবদুল গণি মিয়া একজন সফল উদ্যোক্তা। দেশের স্বনামধন্য গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী বুনিয়ান নীট ফ্যাশন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিনি। তার দক্ষ নেতৃত্বে এই ফ্যাক্টরি সুনাম অর্জন করেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষ করে কর্মসংস্থান তৈরি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। আবদুল গণি মিয়ার এটাই একমাত্র পরিচয় নয়, তিনি কর্মদক্ষ শিক্ষিত জনগোষ্ঠি তৈরিতে অবদান রাখতেও সচেষ্ট। তবে এক্ষেত্রে তিনি একেবারেই নীরবে কাজ করে চলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রের নীরব এই পৃষ্ঠপোষক যাপন করেন নিয়মানুবর্তিক জীবন। কর্মক্ষেত্রে সফলতার চুঁড়ায় পৌঁছানো এই মানুষটি নিয়ম করে সূর্য ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে যান। ঢাকা শহর জেগে ওঠার আগেই তিনি পৌঁছে যান তার প্রিয় ফ্যাক্টরী বুনিয়ান নীট ফ্যাশন লিঃ এ।

আবদুল গণি মিয়া মনে করেন যেকোন ডিগ্রীর চাইতে সবার আগে ভালো মানুষ হওয়া জরুরী। শিক্ষা অর্জনের জায়গা কেবল স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় নয়। শিক্ষা অর্জন করার জন্য মনোযোগী হতে হয় ঘর থেকে বাহির পর্যন্ত, আলো থেকে অন্ধকার পর্যন্ত। যে কোন কিছুতেই গভীর মনোযোগ দিলে তা হয়ে উঠতে পারে একটি বইয়ের পরিপূরক। আর জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন মনে করেন আত্মসম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকাকে।
আবদুল গণি মিয়া তার কর্মীদের মানবিক জীবন যাপনে সচেষ্ট। তিনি তার ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সময়মতো সম্মানজনক বেতন পরিশোধ করতে পিছপা হননা।আর অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে ভীষণ উদার, তার ফ্যাক্টরীতে নিয়মিত ভাবে "Best Employee Award" দেওয়া হয়। নিজের হাতে তিনি কর্মীদের প্রতি মাসে এই সম্মাননা দিয়ে থাকেন।
তিনি বলেন, কেউ উদ্যোক্তা হলে যেন, মানবিক কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হন। ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি সৎ এবং স্বনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দেন। তার মতে, যেকোন পেশায় ভালো মানুষ হবার বিকল্প নেই।

সুবিধাবঞ্চিত মেধাবীদের গড়ে তোলার ব্যপারে তিনি অত্যন্ত আন্তরিক। নিজের এলাকা এবং নিজের শহরের অনেক দরিদ্র অবহেলিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন নীরবে। শুধু মানুষ নয়, প্রাণীকূলের প্রতিও রয়েছে তার সীমাহীন মমতা, নিজ এলাকা এবং এলাকার বাইরে অবলা প্রাণীদের জন্যে অকাতরে অর্থ দান করেন। নিজের পোষা প্রাণী আছে বলেই হয়তো প্রাণীদের ভাষা বোঝেন, করোনাকালে রাস্তার প্রাণী অধিকার রক্ষাকারী সংগঠনগুলোকে তিনি বিপুল অর্থ দান করেছেন। তাঁর বসবাসের এলাকা মিরপুর ডিওএইচএস-এ, কোন বেওয়ারিশ পশু নেই, প্রতিটি পশুই কারো না কারো তত্ত্বাবধায়নে আছে। ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তিনি বিভিন্ন সময়ে বিশেষ ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। তাদের Internship, চাকরী সহ অন্য যেকোন সমস্যায় তিনি এবং তার প্রিয় প্রতিষ্ঠান EUB'র পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। EUB পরিবারের পক্ষ থেকে এই উদার শিক্ষানুরাগীর জন্য শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা।

ব্যর্থতার উপকারিতা এবং কল্পনাশক্তির গুরুত্ব
জে কে রাউলিং
অনুবাদ করেছেনঃ মুশফিকা বিন্‌তে কামাল,সিনিয়র লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস।

জে কে রাউলিং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি অর্জনের পর ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনাদের আজ আমি যা বলব তা হচ্ছে আমার গ্রাজুয়েশনের দিন এবং আজকের দিন, এই সময়ের মধ্যে শেষ হওয়া ২১ বছরের মধ্যে জীবন থেকে যে যে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা পেয়েছি তার সারমর্ম। আমি আপনাদের সাথে আজকে ব্যর্থতার সুবিধা সম্পর্কে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং একই সাথে কল্পনাশক্তির গুরুত্ব উপস্থাপন করতে চাই। আজকের এই চমৎকার ঝলমলে দিনটিতে আর যা নিয়ে কথা বলবো তা হলো- হেরে যাওয়া মানে শেষ হয়ে যাওয়া নয়।

আমি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করি ২১ বছর বয়সে আর বর্তমানে আমি ৪২ বছর বয়সের এক নারী। এরই মাঝে আমার জীবনে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা। আমার শিক্ষাজীবনের শুরুতে আমার নিজের জীবনের লক্ষ্য এবং আমার সবচেয়ে কাছের লোকেরা যা আমার কাছে প্রত্যাশা করেছিল তার মধ্যে বিস্তর তফাৎ ছিল এবং আমি এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় দিন যাপন করছিলাম।

জীবনজুড়ে আমার কেবল একটিই স্বপ্ন ছিল, আমি সবসময় কেবল একটি কাজই করতে চেয়েছি- সেটি হচ্ছে উপন্যাস লেখা। যথারীতি আমার বাবা-মা'র এই ব্যাপারে কোন সমর্থন ছিল না! বাবা-মা দুজনেই উঠে এসেছেন অসচ্ছল পরিবার থেকে, কলেজ পর্যন্ত পড়ালেখাও করেননি দুজনের কেউ। আমার এই স্বপ্নটি তাদের কাছে ছিল একদম ছেলেমানুষি একটি ব্যাপার। এটি করে আমি কখনো টাকা-পয়সা আয় করতে পারবো সেটি তারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেননি! তাই তারা আমাকে বাধ্য করলেন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একটি ডিগ্রি অর্জন করতে। আমার ইচ্ছা ছিল ইংরেজি নিয়ে পড়ার, কিন্তু সেটিতে তাদের সমর্থন ছিল না। তাই আমি ভর্তি হলাম আধুনিক ভাষা বিভাগে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়া হতে তাদের গাড়ি চোখের আঁড়াল হতে না হতেই আমি ছুটলাম ক্লাসিকস বিভাগের করিডোরে!

আমার মনে পড়ে না বাবা-মা কে কখনো জানিয়েছি আমার এই কাজের কথা, খুব সম্ভবত আমার সমাবর্তনেই তারা প্রথম আবিষ্কার করেছেন আমি এতদিন ক্লাসিকস নিয়ে পড়েছি! আমি খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই একটি কথা- আমি কোনদিন আমার বাবা-মাকে তাঁদের এমন চিন্তা চেতনার জন্য দায়ী করিনি। সত্যি বলতে কি, খাবারের যেমন একটি মেয়াদোত্তীর্ণ দিন থাকে, তোমার জীবনের সিদ্ধান্তগুলোর জন্য বাবা-মাকে দায়ী করারও তেমনি একটি মেয়াদ রয়েছে। তুমি যখন বড় হবে, তোমার জীবন কোনদিকে যাবে কীভাবে যাবে সেই দায়ভারটি কেবল তোমার ওপর, পৃথিবীর আর কাউকে এই সিদ্ধান্তগুলো নেয়ার সুযোগ দিতে পারো না তুমি।

আমার বাবা-মা কেন আমাকে ডিগ্রি নেয়ার জন্য জোর দিয়েছিলেন সেটি আমি অনুভব করতে পারি। তাঁরা চেয়েছিলেন আমাকে যেন কোনদিন তাদের মতো করে অভাবে পড়তে না হয়, তাদের মতো। তাদের সারাটি জীবন কেটেছে কঠিন দারিদ্র্যে এবং ছোটবেলা থেকে আমি দেখে এসেছি দারিদ্র্য কি ক্ষমাহীন, দুঃসহ একটি জিনিস। দারিদ্র্য তোমার স্বপ্নগুলোকে সংকীর্ণ করে দেয়, তোমার হাত-পা হাজারটা শেকলে বেঁধে ফেলে, বিষন্নতা-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় বিষাক্ত করে তোলে তোমার হৃদয়। দারিদ্র্য জিনিসটিকে শিল্প-সাহিত্যে অনেকসময় খুব রোমান্টিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু বিশ্বাস করো বাস্তবে এর মাঝে সুন্দরের লেশমাত্র নেই! অভাবের অন্ধকূপ থেকে আপন উদ্যোগে বেরিয়ে আসতে পারা, জগতের রূপরস একবার প্রাণভরে উপলব্ধি করার সুযোগ পাওয়া-সে কী অসাধারণ গৌরবের, অসম্ভব আনন্দের একটি অভিজ্ঞতা সেটি যে নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেনি তাকে কখনো বলে বোঝানো যাবে না!

কিন্তু তোমাদের বয়সে দারিদ্র্য আমার দুশ্চিন্তা ছিল না, আমার ভয় ছিল একটি জিনিসে- ব্যর্থতা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার জীবন কোনদিকে যাবে সে ব্যাপারে আমার তেমন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। ক্লাসে, লেকচারে, বন্ধুদের আড্ডায় আমাকে খুঁজে পাওয়া ছিল দায়। আমার দিনের বেশিরভাগ সময় কাটতো একদম একলা- কফি শপের এক কোণায় বসে গল্প লেখার চেষ্টায়। ছাত্রজীবনে তোমরা অনেকেই সাফল্য-ব্যর্থতা যাচাই করো পরীক্ষায় কে কত পেয়েছে তার ওপর। আমি নিজে পরীক্ষার সবসময় ভাল ফলাফল করে এসেছি কিন্তু তা নিয়ে আমার মনে কোন পরিতৃপ্তি ছিল না, পরীক্ষার নাম্বার দিয়ে জীবনে আসলেই খুব বেশি কিছু আসে যায় না!

সাফল্য জিনিসটি অনেকটা মরীচিকার মতো। তুমি দারুণ মেধাবি, উচ্চশিক্ষিত বলেই যে জীবনে সাফল্য পাবে সবসময় কিন্তু সেটি সত্যি নয়! তুমি যখন একবার হেরে যাওয়া শুরু করবে তখন হঠাৎ করে আবিষ্কার করবে পৃথিবী কী নিষ্ঠুর একটি জায়গা! সবাই তোমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে যে তুমি একজন হেরে যাওয়া মানুষ, চলার পথে অনেকবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অপমানের মাধ্যমে সেটি তোমাকে মনে করিয়ে দেয়া হবে।
ব্যর্থতার দিনগুলোতে অপমান গায়ে মাখানো একটি বিলাসিতা, সেটি আমি বুঝতে পেরেছি যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনোর সাত বছর পর নিজেকে দেখতে পেলাম ব্যর্থতার সাগরে তলিয়ে যেতে। আমার না ছিল কোন চাকরি, না আয়ের কোন উৎস। পরিবার বলতে একমাত্র সন্তানকে নিয়ে এই বিশাল শহরে একদম একা একটা মানুষ- সেটি যে কী দুঃসহ, অসহায় একটি অনুভূতি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! আমার বাবা-মা সারাজীবন যেই ভয়টি করে এসেছেন- আমি তা কিছুতেই এড়াতে পারিনি, দারিদ্র্যের শেকল আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। এই ব্যাপারটি কী দুঃখের, কী যে হতাশার! আমার চেয়ে ব্যর্থ মানুষ যেন আর দ্বিতীয়টি নেই এই পৃথিবীতে! আমি আত্মহত্যা করার কথাও ভেবেছিলাম। শুধু মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে পেরে উঠিনি। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমি নিজেকে সামলে নিই। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার নিজের এই অবস্থা হলে মেয়েকে মানুষ করতে পারব না। অতঃপর নিজেকে শেষ করে দেয়ার বদলে আমি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই এবং নয় মাস ধরে একজন কাউন্সিলরের কাছে চিকিৎসা নিতে হয় আমাকে।

প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন তাহলে আমি ব্যর্থতার সুফল নিয়ে কথা বলতে এসেছি? কারণ ব্যর্থতা তোমাকে শেখাবে জীবনের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দূরে সরিয়ে দিতে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু মেনে চলতে হয়। তুমি চাইলেই অনেক কিছু করতে পারো না, সমাজের রীতিনীতি, কাছের মানুষদের প্রত্যাশা সবকিছুর ভার কাঁধে নিয়ে চলতে হয় প্রতিটি পদক্ষেপে। কিন্তু যখন তোমার আর হারানোর কিছু থাকে না, তখন একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটে- তুমি একদম মুক্ত একটি মানুষ হিসেবে সবকিছু নতুন করে শুরু করতে পারো! কে কী ভাবছে তোমাকে নিয়ে তাতে তোমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা থাকে না। বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পেতে তোমার একটা কিছু আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন হয়। তুমি তোমার সবটুকু প্রাণ ঢেলে শুধু সেই স্বপ্নটি সত্যি করার পেছনে ছুটে চলো। তোমার একটি জেদ চেপে যায় সবাইকে ভুল প্রমাণ করার যারা বলে এসেছে তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।
আমি তাই একদিন ঘুম থেকে উঠে অনুভব করলাম হয়তো সমাজের চোখে আমার মতো পরাজিত মানুষ আর দ্বিতীয়টি নেই, কিন্তু তাই বলে তো আমি এখনো মরে যাইনি! আমার কোলজুড়ে ফুটফুটে একটা সন্তান রয়েছে, সম্বল বলতে আছে পুরোন একটি টাইপরাইটার আর বুকের মাঝে এখনো বেঁচে আছে আকাশছোঁয়া কিছু স্বপ্ন!
তোমার পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায় কেবল তখনই তুমি আবিষ্কার করতে পারবে বুকের ভেতর কী অদম্য একটি বারুদ রয়েছে তোমার, কী ভীষণ ক্ষুধার্ত তুমি আরেকবার ঘুরে দাঁড়াতে! পানিতে ডোবা মানুষ যেভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে তুমি তখন সাফল্য খুঁজে বেড়াবে সেভাবে- ব্যর্থতার অনলে যে মানুষটি দগ্ধ হয়নি সে এই অনুভূতিটি কোনদিন উপলব্ধি করতে পারবে না!
হেরে যাওয়া মানে তাই শেষ হয়ে যাওয়া নয়, হেরে যাওয়া মানে নতুন করে আরেকবার শুরু করা জীবনটাকে, নতুন করে নিজের অপার সম্ভাবনাগুলোকে আবিষ্কার করা, নতুন করে নিজের স্বপ্নের পিছে ছুটে চলা ধূমকেতুর তীব্রতায়।
ব্যর্থতাকে আমি তাই বুকে টেনে নিয়েছি ভালোবেসে। ব্যর্থতা আমার প্রেরণা নিরন্তর ছুটে চলার পথে, ব্যর্থতা আমার জীবনে আশীর্বাদ। পৃথিবী বদলে দেয়ার শক্তি আমাদের ভেতরে আছে, সে জন্য জাদু জানার প্রয়োজন

নেই। একটা আরও সুন্দর পৃথিবী আমরা কল্পনা করতে পারি। অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও কারও কারও জীবনে আনন্দ নেই। আবার ছোট্ট কোনো অর্জনও কখনো কখনো মানুষের মনে অদ্ভুত প্রশান্তি দেয়। একের পর এক অর্জনই জীবনের সব নয়, এটা যখন বুঝা যাবে তখনই আমরা ব্যক্তিজীবনে সুখী হতে পারব। আমাদের জীবন কখনই আমাদের যোগ্যতার প্রতিফলন নয়। আমার মতে জীবনটা হলো একটা গল্পের মতো। 'গল্পটা কত বড়, তাতে কিছু যায় আসে না। বরং দিন শেষে গল্পটা কতখানি ভালো, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।'

[সাক্ষাৎকার]

'শিক্ষা কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা'

১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠব্যক্তি। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের জবানিতে উঠে এসেছে সংবিধান রচনা, বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং পূর্বাপর অনেক ঘটনা। বিশেষ সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দীন ইউসুফ।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে সংবিধান- প্রথম সংবিধান ১৯৭২-এ রচিত হয় আপনি তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আপনার সেই সময়ের কথা যদি আমাদের একটু বলতেন।
আনিসুজ্জামান : ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম বৈঠক হয়। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে যারা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেসব সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। এর মধ্যে বাদ যান যারা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সময় সহযোগিতা করেছেন। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনেই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩৩ সদস্যের এক কমিটি গঠিত হয়। আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এই কমিটির সভাপতি হন। আমার যতদূর মনে পড়ে, '৭২ সালের এপ্রিল মাসে গণপরিষদ এ কমিটি গঠন করল এবং মোটামুটি আশা করা হলো যে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আগেই আমাদের সংবিধান রচনা শেষ হবে। আট মাসেই, ৯ মাসও না। বঙ্গবন্ধু খুব উদ্দীপ্ত ছিলেন- বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান হতে যাচ্ছে! বাংলায় সংবিধান হতে যাচ্ছে এবং পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান করতে ৯ বছর লাগল, আমরা ৯ মাসেই সেটা করে ফেলব। এসব নিয়ে উনি খুব উদ্দীপ্ত ছিলেন। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার যে চার মূলনীতি, এটা সম্পর্কেও তার খুব ভাবাবেগ ছিল। তবে আমার স্পষ্টই মনে পড়ে, বঙ্গবন্ধু একাধিকবার আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বলেছিলেন, এই চার নীতির মধ্যে তিনি অগ্রাধিকার দেন সমাজতন্ত্রকে। আমার মনে হয় যে, এটা সবার জেনে রাখা ভালো। ১৯৭২ সালের কথাই আমি বলছি। উনি পরবর্তী সময়ে চতুর্থ সংশোধনী করলেন তার পেছনে যে মনোভাবটা ছিল, সেটা একেবারেই হঠাৎ চুয়াত্তর-পঁচাত্তর সালে আসেনি। উনি সমাজতন্ত্রকে পয়লা জায়গায় নিয়েছিলেন।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ : আপনি শুরু থেকেই সংবিধান প্রণয়ন কমিটিরতে **যুক্ত ছিলেন?**
আনিসুজ্জামান : শুরু থেকে সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন হওয়ার পর ড. কামাল হোসেন আমাকে বলেন, বাংলায় মূল ভাষ্যটা বলা হবে এবং আমাকে সেটা করতে হবে। আমি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি। ড. কামালকে বললাম আমার তো কিছু সাহায্য লাগবে। তিনি বললেন আপনি লোক বেছে নেন। আমার স্কুলজীবনের সহপাঠী নিয়ামুল বাছির ও ছিল গণপরিষদে- বিতর্ক বিভাগে সহ-সম্পাদক, পরে সম্পাদক হয়েছিল। সে নানা ভাষা

জানত। বেতারে অনেক দিন কাজ করেছে। এর পর গণপরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাজেই অনেক বিশাল ওর জানাশোনা। এইটা কাজে লাগবে বলে ধরে নিয়েছিলাম। আমি ওকে বললাম আর কাকে নিতে পারি? গণপরিষদের ওর একজন সহযোগীর কথা বলল। এ কে এম সামসুজ্জামান-এর নাম মনে পড়ে এখন। আমরা তিনজনে মিলে বাংলা ভাষ্যটা করি। পরে একটা কমিটি করা হয়। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তখন। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ড. মযহারুল ইসলাম এবং আমাকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। আমাকে তার সদস্য সচিব করা হয়। এই কমিটি সংবিধানের বাংলা ভাষ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে। তবে কমিটি খুব যে বেশি সময় পেয়েছিল তা না। মোটামুটি আমরা যে কাজটি করে নিয়েছিলাম সেটি তারা অনুমোদন করেন। গণপরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে এই তিনজনকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় কিন্তু পশ্চাতে আরও দু'জন ছিল, যাদের কথা সামনে আসেনি। নিয়ামুল বাছির ও সামসুজ্জামান। উনাদের নামটা সেভাবে আসেনি।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ :তখন কি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে এই সংবিধান রচনা নিয়ে আপনার কোনো কথাবার্তা হয়েছিল?

আনিসুজ্জামান : এখন যেটা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, ওটা ছিল গণপরিষদ। ওখানে একটি ঘরে আমি বসতাম। গণপরিষদে যে আলোচনা হতো সেই আলোচনা আমি ঘরে বসেই শুনতে পেতাম। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো, কথা হতো। সংবিধানের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু কিছু মত দিতে চাইলে ড. কামাল হোসেনকে ডেকে পাঠাতেন। এই রকম দুইবার আমি ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে ছিলাম। নিশ্চয়, কামাল হোসেন আরও বেশিবার গেছেন। একবার বঙ্গবন্ধু বললেন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে সংবিধানে একটা অনুচ্ছেদ থাকতে হবে। এটাই পরে বাংলাদেশের সংবিধানে ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে রূপ নেয়। এখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করা হয়। এবং সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠনের পথকে বাধা দেওয়া হয় বা বন্ধ করে দেওয়া হয়; বলা যেতে পারে। আরেকবার বঙ্গবন্ধু বললেন, পাকিস্তানের গণতন্ত্রের যে অস্থিরতা, সেইটার একটা কারণ ছিল 'ফ্লোর ক্রসিং'- সংসদ সদস্যদের এক দল থেকে আরেক দলে যাওয়া। যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে কোনো মন্ত্রিসভা মাত্র ১৫ দিন টিকে ছিল-এ রকম। যার ফলে তৈরি হলো ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ, যেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক এখনও আছে, তখনও হয়েছিল। কিন্তু এখন আরও বেশি হয়েছে; বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে। অনেকে বলেন, ৭০ অনুচ্ছেদ গণপরিষদের সদস্যদের অধিকার হরণ করেছে কিন্তু আমার এখনও মনে হয় এটি গণপরিষদের সদস্যদের অপব্যবহার রোধ করেছে। তবে এখন অভিজ্ঞতার আলোকে হয়তো অন্য কোনো ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারি। তারপর যখন গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে তখন বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন মাত্র দু'জন-ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। বঙ্গবন্ধু একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বক্তৃতা শোনো? আমি বললাম 'আমার ওপাশটা তো খোলা থাকে; কিছু কিছু শুনি'।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ : অসাধারণ একটা কথা।

আনিসুজ্জামান : উনি সংবিধান রচনার অগ্রগতি সম্পর্কে নিজেকে অবহিত রাখতেন এবং কী করলে ভালো হবে, যেমন- সংবিধানের যে কপিতে সই করা হলো, উনি শিল্পী জয়নুল আবেদিনকে ডাকলেন এবং বললেন যে, আপনি এটা তৈরি করুন। এর মধ্যে নকশা থাকবে, সবটা হবে হাতের লেখা তখন আমি প্রস্তাব করেছিলাম এ কে এম আব্দুর রউফ আমাদের একজন চিত্রকর রউফকে দিয়ে লেখালেই ভালো হবে। রউফ তখন লন্ডনে আমাদের হাইকমিশনে কাজ করতেন ওর হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। বঙ্গবন্ধু আমার কথা সমর্থন করলেন তখনই বললেন যে, হাইকমিশনে জানাও, ও এখানে এসে থাকুক। রউফ, হাশেম খান, আবুল বারকাত পৃষ্ঠাগুলো আঁকলেন আবেদিন সাহেবের নেতৃত্বে।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ : শেষ কবে হলো?

আনিসুজ্জামান : নভেম্বর মাসের ৪ তারিখে গণপরিষদে সবটা উপস্থাপন করা হলো। নভেম্বরের শেষে এটা গৃহীত হলো এবং এতে তখন লেখা হলো, সংবিধানের একটি অনুমোদিত ইংরেজি পাঠ থাকবে; ইংরেজি-বাংলায় সংঘর্ষ হলে বাংলাটা প্রাধান্য পাবে; তখন আমি বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছি যে, কোথায় কোন ভুল করলাম সেটার জন্য কী না কী হয়! পরে দেখেছি যে, না তেমন কিছু হয়নি। কারণ ইংরেজি-বাংলা নিয়ে দুটো মামলা হয়েছিল। এটা জাস্টিস হাবিবুর রহমানের একটা লেখার মধ্যে আছে। এই দুটোতেই হাইকোর্ট বলেছিলেন যে- না, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য হচ্ছে না।

একটি রায়ে বলা হয়েছিল, যদি কোনো পার্থক্য থেকেও থাকে, বাংলা ভাষাটা ইংরেজি ভাষার থেকে পরিস্কার। তো, কাজেই এইদিক থেকে আমি রেহাই পেয়ে গেছি, বলা যায়। এখন তো আইন মন্ত্রণালয়ের ড্রাফটম্যানরা এই কাজগুলো করে। বাংলা সংবিধানের কোনো আদর্শ তো আমাদের সামনে ছিল না।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ : এটা তো স্যার বাংলা ভাষার প্রথম সংবিধান, আর বাঙালির জীবনের প্রথম সংবিধান...

আনিসুজ্জামান : প্রথম সংবিধান। তা ছাড়া আমরা কেউই আইনের লোক ছিলাম না। কাজেই আমাদের কাজ খুব জটিল ছিল।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ : আমাদের যারা আইনের সাংসদ ছিলেন তাদের সঙ্গে তো আপনাদের নিশ্চয়...

আনিসুজ্জামান : হ্যাঁ, খসড়া প্রণয়ন কমিটির প্রত্যেক বৈঠকে আমি উপস্থিত থাকতাম। ড. কামাল হোসেন বাংলা ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন করতেন। তাদের কথা শুনতে হতো, ব্যাখ্যা করতে হতো। তবে আমি বলি যে ড. কামাল হোসেনের অবদান খুব বেশি। সংবিধানের ইংরেজি ভার্সন তার নিজ হাতে করা। তার পরে আমি যখন তাকে অনুরোধ করেছি যে, কোনো একটি বিভাগ যেভাবে বাংলায় করতে চাই, তাতে ইংরেজিটা একটু বদলে দেওয়া দরকার। বদলে দিয়েছেন। ফলে এই দুটোর সামঞ্জস্যটা হয়েছে। উনি এটা না করলে আমি কাজটা এভাবে এগিয়ে নিতে পারতাম না।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ : স্যার, এই যে আপনি বললেন যে বঙ্গবন্ধু বলেছেন সাম্প্রদায়িকতা নিষিদ্ধ থাকতে হবে, আর একটা হচ্ছে সমাজতন্ত্র, মানুষের সমঅধিকার। উন্নত সংস্কৃতির মানুষের এটা মনোভাবনা হতে পারে, চিন্তা-চেতনা হতে পারে। যে রাজনৈতিক আবহের মধ্যে থেকে বঙ্গবন্ধু বড় হয়েছেন, যে সংগ্রাম এবং পাকিস্তান পূর্বকাল ও পাকিস্তানকাল। আপনি তো পুরোটা তাকে খেয়াল করেছেন। কবে থেকে আপনি বঙ্গবন্ধুকে চিনেছেন?

আনিসুজ্জামান : আমি তাকে প্রথম দেখি ১৯৫৬ সালে, চীনে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হয়েছিল; তিনি গিয়েছিলেন পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে। যারা পূর্ববাংলা থেকে গিয়েছিলেন ওরা ফিরে আসার পরে একটা সংবর্ধনা হয় ঢাকা জেলা পরিষদ মিলনায়তনে। ওইখানে তাকে প্রথম দেখলাম। তারপরে যখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হলো, তখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পল্টন ময়দানের জনসভা পণ্ড হয়ে গেল। তখন আমাদের এক বন্ধু আহতও হলো। আমি তাকে দেখতে হাসপাতালে গেছি, তখন বঙ্গবন্ধু এলেন। তারপরে হয়তো এদিক-ওদিক দেখা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে '৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তিলাভ করার পরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগটা বেশি হয়।

একটা ঘটনা বলি, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ বছর অধ্যাপনা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে যাই ১৯৬৯ সালের ৩ জুন। আমি গাড়ি চালিয়ে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলাম, কুমিল্লার চান্দিনার কাছে গিয়ে মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ফিরে আসি। বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখতে এলেন, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন। তখন খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল মোমিন, উনি বাসায় ছিলেন।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ : তখন বাসা কোথায়, স্যার?

আনিসুজ্জামান : নীলক্ষেতে। '৬৯ সালের জুন মাসে বঙ্গবন্ধু আমার বাসায় এলেন। এমনি কথাটথা বললেন-এই কেমন আছি, ইত্যাদি। তারপরে উনি যখন উঠেছেন চলে যাওয়ার জন্য, তখন আমার পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে রুচি, ও এসে আমার কানের কাছে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করছে- আসাদ আসেনি? মানে তখন ছেলেরা মিছিল করত-'আসাদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব।' তো, রুচির ধারণা হয়েছে, আসাদ আর একজন বঙ্গবন্ধুর মতোই নেতা। বঙ্গবন্ধু আমাকে বললেন, তোমার মেয়ে কী বলে? আমি বললাম- আসাদ আসেনি, তাই জিজ্ঞেস করল। তো, বঙ্গবন্ধু ওর গালটা ধরে বললেন যে, ওরা আমার কাছে এই কৈফিয়ত তো চাইতেই পারে। আমি খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ :আমি স্যার আর একটি জিনিস জানতে চাইব। এই যে সমাজতন্ত্রের কথা বলা অথবা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা বলা; আজকের পটভূমিতে ভীষণ জরুরি। আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের। তিনি এই বিষয়গুলো অত্যন্ড় পরিস্কারভাবে আপনাদের মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আনিসুজ্জামান : সংবিধানে চার মূলনীতির কথা আছে সেগুলো প্রায় সমান গুরুত্ব। তবে আমি একটু আগে এ কথা বললাম যে- বঙ্গবন্ধু নিজে এই চারটিকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু এর মধ্যে যদি তারতম্য করতে হয়, সমাজতন্ত্রে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এইটা উনি ঠিক কবে থেকে ধারণ করলেন বলা মুশকিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, '৬৬ সালে আওয়ামী লীগের যে ঘোষণাপত্র, তাতে সমাজতন্ত্রের কথা ছিল। '৭০ সালের নির্বাচনের পরে বঙ্গবন্ধু করাচির 'ডন' পত্রিকায় একটা সাক্ষাৎকার দেন। খুব সম্ভব পয়লা মার্চে এটা বের হয়েছিল সেইখানে উনি বলেছিলেন, 'আমার লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা'। অনেকেই বলে যে, আওয়ামী লীগ তো উঠতি ধনতান্ত্রিকদের সংগঠন; সমাজতন্ত্রের কথা তারা আন্তরিকভাবে বলে না কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কাছে এটা একটা আন্তরিক ব্যাপার ছিল।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ : আর একটা বিষয় স্যার, '৭২ থেকে '৭৫- এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ বা কোনো স্মৃতি আপনার আছে?

আনিসুজ্জামান : দুটো কাজের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম। একটা হচ্ছে সংবিধানের কথা বললাম, আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনে, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ড. মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা। শিক্ষা কমিশন গঠন হওয়ার পর এর উদ্বোধন হতে অনেক সময় নিয়েছিল। কারণ তখন ছাত্ররা বলছে- শিক্ষা কমিশনে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। এটা নিয়ে একটা অচল অবস্থা। শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু একটা লম্বা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার পরে তিনি বললেন, আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করেন। আমি দুটো প্রশ্ন করেছিলাম। বলেছিলাম যে, আমাদের জাতীয় আয়ের কতভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে? এটা যদি সরকার আমাদের বলে দেয়, তাহলে আমরা সেই মতো সুপারিশ করতে পারি। আর বলেছিলাম যে, শিক্ষা কমিশন সরকার গ্রহণ করুক বা না করুক, এর দ্বিমত পোষণকারী মন্তব্যসহ এটা ছাপতে হবে। বঙ্গবন্ধু প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, আপনারা টাকা-

পয়সার কথা ভাববেন না। আমি ভিক্ষা করে হলেও টাকা-পয়সা জোগাড় করে দেব। কিন্তু আমি চাই যে দেশের জন্য একটি ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে। আপনারা আপনাদের সাধ্যমতো একটা ভালো ব্যবস্থার কথা বলেন। আর কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করার ব্যাপারে উনি বললেন যে, বাংলাদেশ সরকারের কিছুই তো গোপন থাকে না; সবই প্রকাশ হয়ে যায়। এটাও হবে। আমি বললাম- না, ওই রকম প্রকাশ চাই না। সরকারিভাবেই প্রকাশ হলে চলবে। এ তো '৭২ সালের কথা বললাম। '৭৪ সালের মে মাসে ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে কমিশনের সব সদস্য রিপোর্ট দিতে গেলাম বঙ্গবন্ধুর কাছে। বঙ্গবন্ধু এলেন এবং আরম্ভ করার আগেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে, তুমি সবার শেষে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। বললাম, আচ্ছা। যখন দেখা করতে গেলাম, উনি বললেন- তোমরা নাকি এমন রিপোর্ট তৈরি করেছ, যেটা বাস্তবায়ন করতে গেলে আমার পুরো বাজেট চলে যাবে। আমি বললাম, আপনি কি পড়েছেন পুরো রিপোর্ট? বললেন, আমার পড়ার সময় কোথায়? আমাকে আমলারা যা বলেছে, আমি তার থেকে বলছি। আমি বললাম যে, এটা ঠিক না; সব স্কুলেই লাইব্রেরি থাকা দরকার। আমরা আর্থিক বিবেচনায় বলেছি, ইউনিয়ন পর্যায়ে লাইব্রেরি থাকবে। এই কথাবার্তা হলো। বঙ্গবন্ধু যখন মস্কো থেকে ফিরে এসেছেন, অসুস্থ ছিলেন কিছুদিন। তো, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, কেমন আছেন? উনি বললেন যে, আমি ভালো নেই, আমি মস্কো থেকে চলে এলাম চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে। তার কারণ যখন শুনলাম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে সাতজন ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে, তখন আমি আর ওখানে থাকতে পারলাম না। বললাম যে, দেশে আপনি বিশ্রাম নেন। বললাম যে, ঢাকায় বিশ্রাম নেন। বললেন- কীভাবে নেব? লোক তো আসেই সব সময়।

আমি বললাম যে, ঢাকার বাইরে যান; লোককে দেখা দেবেন না। তখন তার চোখে প্রায় পানি চলে আসছে। বলছেন যে, লোককে খেতে দিতে পারছি না, পরতে দিতে পারছি না। এখন যদি দেখা দিতে না পারি, তাহলে আর আমার কী থাকবে! এইটা একটা আবেগের কথা। কিন্তু একেবারে প্রাণের কথা। ওই দিনই উনি আমাকে বললেন যে, কবীর চৌধুরী তখন শিক্ষা সচিবের দায়িত্বে আছে। উনি ওটা ছেড়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। উনি বললেন যে, আমি চাই তুমি শিক্ষা সচিবের দায়িত্ব নাও। বললাম যে, আমি পারব না। প্রথমত, এই কাজ আমার নয়। দ্বিতীয়ত, আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছি, আমাকে ঘুরে আসতে দিন। বললেন যে, ভাবো আর কালকে এসে আবার বলো। তো আমি বললাম, তারপর বললেন যে- আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও বিলেতে, তারপর ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে চাটগাঁও যাবে বা যেখানে যাবার যাবে। আমি ফিরে এলাম '৭৫ সালের ১১/১২ আগস্টে। ১৫ তারিখে তো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেই গেল। আমি আর উনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগও পেলাম না।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ :আপনি তখন কোথায় ছিলেন, যখন হত্যাকাণ্ডের কথা আপনি শোনেন?

আনিসুজ্জামান : আমার আব্বা রেডিওতে শুনলেন। রেডিওতে শুনেই উনি আমাকে ডেকে জানালেন। আমিও তখন শুনলাম রেডিওতে; ডালিমের সেই ঘোষণা। তারপরে আমি বেরিয়ে গেলাম। ড. কামাল হোসেন তখন অক্সফোর্ডে ছিলেন। তার পরিবার ছিল ঢাকায়। তো প্রথমত, আমি ওদের খবর নিতে গেলাম। পুরো বিষয়টা এত আকস্মিক যে, বুঝে উঠতে সময় লেগেছিল। একজন মানুষ, দেশটাকে যিনি স্বাধীন করে গিয়েছেন, মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, সেই লোকটার মৃত্যুতে আমরা নিশ্চিতভাবে একটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ :যে মানুষটি দেশকে স্বাধীন করে দিয়েছেন, সে মানুষের হত্যা আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা।

আনিসুজ্জামান : নিশ্চয়ই। বঙ্গবন্ধু হত্যা হয়েছে শুনে আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি দেওয়ার চেষ্টার নামান্তর। এবং আমার তখনই শুনে মনে হয়েছিল যে, এর সঙ্গে পাকিস্তানের একটা সম্পৃক্ততা আছে। আমরা ওভাবে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা পাইনি, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিদেশে থাকার আয়োজন করার ব্যাপারে যে পাকিস্তানের হাত রয়েছে, বিশেষ করে লিবিয়ায়; এটা তো সবাই জানে।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ : জানতে চাইব, আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন বঙ্গবন্ধুকে- একজন বাঙালি হিসেবে।

আনিসুজ্জামান : মানে এইভাবে যদি দেখি যে, পূর্ববাংলার একটি মহকুমা শহরের বড় হওয়া মানুষ। কলকাতায় রাজনীতি করতেন। এবং সেখানে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে, দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করেছেন। দুর্ভিক্ষের সময় লঙ্গরখানায় কাজ করেছেন। দাঙ্গার সময় মুসলমান মেয়েদের উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে এসেছেন। আবার হিন্দু শিক্ষককে নিরাপদে এলাকা পার করে দিয়েছেন। এই যে নানা রকম দিক তার। একদিনে তো গড়ে নাই। তিলে তিলে নিজেকে তৈরি করেছেন তিনি আসলে। এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত। এই যে তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা'- এগুলো পড়লেই তো বোঝা যায়, কেমন দরদী মানুষ। এগুলো তো উনার চরিত্রের অপরিহার্য দিক। মানুষের জন্য তার যে অনুভূতি, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য, তার কল্যাণ করার জন্য চেষ্টা, এইটা একদম বানানো ব্যাপার নয়। এটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পরের ব্যাপার নয়। এটা একেবারে প্রথম থেকেই। কাজেই বলা যায় যে, নেতৃত্বের গুণ ছিল এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষকে সেবা করার সম্পূর্ণ চেষ্টা ছিল বঙ্গবন্ধুর। মানুষকে সেবা করতে করতেই তো তিনি প্রাণ দিলেন।

[মুজিববর্ষ]

‘৭১ থেকে মুজিব বর্ষ-২০২০: নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

নারী দিবস উপলক্ষে ১১মার্চ ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর আয়োজনে ‘৭১ থেকে মুজিব বর্ষ-২০২০: নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর গাবতলীতে ভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসে বৈঠকটি শুরু হয় ১১মার্চ দুপুর ১২টায়।

আলোচনা

আ.ফ.ম গোলাম হোসেন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৮ মার্চ এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে আজকের আলোচনা। ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ নারী-পুরুষের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দেয়, উভয়ের অংশগ্রহণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করে। আজকের আলোচনার শিরোনাম ‘৭১ থেকে মুজিব বর্ষ-২০২০: নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ’ আমরা এ আলোচনায় নারীর সফলতা, সংগ্রাম, অর্জন এবং এগিয়ে চলার পথে অন্তরায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রফেসর ড. মকবুল আহমেদ খান

নারীকে অধিকার কে দেবে? তাকে মনে রাখতে হবে আমার অধিকার আমি চর্চা করবো। নারীর অবদান অস্বীকার করে একটি সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি বলতে চাই মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান পুরুষের থেকে কোনো অংশে কম নয়, বরং কোথাও কোথাও বেশি। এদেশের নারীদের আত্মসম্মান বিস্ময় জাগায়- ৭১-এ একজন নারীও পাঞ্জাব বাহিনীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেনি, হয় মেরেছে, না হয় মরেছে। আত্মসম্মান, আর মুক্তির আশা নারীকে অদম্য করুক।

ড. ফারজানা আলম

ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে চাকরি করতে এসে নারী হিসেবে কোন বিশেষ সুবিধা নেইনি। আমরা যদি খেয়াল করি, তাহলে দেখবো উচ্চ পর্যায়ে যারা আছেন তাদের মধ্য কোন বৈষম্য নেই। বাংলাদেশে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারী। তারা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং বাস্তবায়ন করছেন- আমরা তার সুফল পাচ্ছি। স্বীকার করতেই হবে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও নারী এগিয়ে যাচ্ছে। যাবে।

শারিতা মিল্লাত

আমি একজন উদ্যোক্তা, নিজের প্রতিষ্ঠানে যখন ঢুকি তখন খেয়াল করেছি যে ফ্যাক্টরির স্টাফরা চিন্তা করে সালাম দেবে কি দেবে না। এখানে একজন পুরুষ হলে কিন্তু স্টাফদের মধ্যে এমন চিত্র দেখা যায় না। আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, বাবা ছেলে এবং মেয়েকে সমান সুযোগ সুবিধা দিয়ে বড় করেছেন এবং পড়ালেখা শিখিয়েছেন। আমি যখন বিদেশে পড়তে যাই বাবার কাছে আত্মীয়রা বড় বড় চিঠি লিখতে শুরু করেন। তারা লেখেন মেয়েকে বিদেশে পড়তে দিও না, নষ্ট হয়ে যাবে। যদিও বাবা সেসব পাত্তা দেয়নি, আমিতো ফেস করলাম, আমার ভাইয়ের কিন্তু কোনো সমস্যা হলো না। এখনকার কথা যদি বলি, আমার দুই ছেলে মেডিকেলে পড়ছে- কোন কারণে যদি তারা পড়ালেখায় পিছিয়ে পরতো- তাহলে কথা উঠতো আমি মা নিজে বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত তাই ছেলেদেরকে ঠিক ঠাক মানুষ করতে পারিনি। এ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এগুলো একজন নারীকে ভেতর ও বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, এর কারণে অনেক নারী পিছিয়ে পরে।

মাহজাবিন আহমেদ মিমি

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ' এ প্রসঙ্গে আসলে আমি স্মরণ করতে চাই আমার মা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনকে। যিনি ৭৫ পরবর্তী আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করেছেন এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছেন। নারীর ক্ষমতায়নে ৮১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত আমাদের বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সংগ্রামের বিষয়টি বলতেই হবে, না বললে অন্যায় হবে। শেখ হাসিনা মোকাবিলা করেছেন দলের ভেতরের স্বক্রিয় ষড়যন্ত্র, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত দেশের ভেতরের চক্রান্ত। শেখ হাসিনাকে গণতন্ত্রের ছবক দেয়ার ছলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট দেশগুলো হেন চেষ্টা নাই যা করে নাই। কিন্তু নারীর উন্নয়ন হচ্ছে। এখন সবকিছুতো আর শেখ হাসিনা পাল্টে দিতে পারবেন না, সামাজের ভেতর থেকে পাল্টাতে হবে, এক দিক থেকে দেখতে গেলে নারীর সফলতা এবং প্রতিবন্ধতা কৌনিকভাবে চলছে। নারীর অধিকার চর্চা বলতে আমি বুঝি, যে গৃহিণী হতে চায়, সে যেন সেটায় হয়। নারী সমঅধিকার বলতে আমি পুরুষ বিদ্বেষী হওয়াকে বুঝি না।

ফারজানা ছবি

আমি একজন অভিনয়শিল্পী, অভিনয় করার সুবাদে ভিন্ন ভিন্ন জীবন অনুভব করার সৌভাগ্য হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রথম পেশাদার বাইক রাইডারের চরিত্রে অভিনয় করি। রাস্তায় বাইক চালানোর সময় দেখেছি মানুষ বিষয়টিকে দুইভাবে দেখছে এক মেয়েরাও পারে, দুই মেয়ে হয়ে বাইক চালাচ্ছে। নারীর অর্জনকে ভালোভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা দিন দিন বাড়ছে সামনে আরো বাড়বে।

রঞ্জনা বিশ্বাস

৭১'এ ধর্ষণের শিকার হওয়া নারীদের পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধু যে সমাজসংস্কারক হিসেবে কত বড় ভূমিকা রেখেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাবনার এক জন সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, আমি যুবকদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন স্বহৃদয়ে তাদের গ্রহণ করে। তারপর দেখা গেল নারী পুনর্বাসন বোর্ডে প্রচুর চিঠি আসতে শুরু করলো। বঙ্গবন্ধু সেসব চিঠি খুলে খুলে পড়তেন। মালেকা বেগম জানালেন, সে সময় মাত্র ১০ থেকে ১২জনকে বিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আজকের সমাজে সে নারীরা বীরাঙ্গনা-মুক্তিযোদ্ধা।

শাপলা সপর্যিতা

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রথমে দরকার নারীর সাহস। অন্যের থেকে কোথাও কোথাও প্রথা শক্তিশালী এগিয়ে যাওয়ার জন্য কখনো কখনো প্রথা ভাঙতে হয়, এক্ষেত্রে নারী সাহসী না হলে পারে না।

আলমগীর রেজা চৌধুরী

নারীর এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও নারী নিজে নিজের জন্য বাধা। দেখা যায়, মা হয়ে ছেলে-মেয়ের মধ্যে ছেলেকে প্রাধান্য দিচ্ছে বা পক্ষপাতিত্ব করছে। এটা তার দোষ না- সমাজে বহুদিনের অভ্যাস। এ অভ্যাস থেকে প্রথমে একজন মাকে বের হতে হবে।

বীরেন মুখার্জী

আমরা মুখে অনেক কথা বলি কিন্তু পরিবারে পুরুষের সিদ্ধান্ত যখন নারী মেনে নিচ্ছে না তখন কিন্তু পুরুষ সেটা মানতে পারছে না। মানে নারী যা কিছু করুক তা পুরুষ নিজের সিদ্ধান্তের বিপরীতে দেখতে প্রস্তুত না। আমরা আসলে নারীকে কব্জা করতে চাই। এ মানসিকতা থেকে বের হতে হবে।

কাজি রাফি

নারী হলো মানব সভ্যতার জন্মদাত্রী। এ কথা আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে। পৃথিবীতে প্রথম যখন চাষাবাদ হয়েছিল সেটা শুরু করেছিল নারী। নারীর ক্ষমতায়নে কিন্তু সব চেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে হবে নারীদেরকেই। পরিবারের বাচ্চাদেরকে তাকেই প্রথমে বোঝাতে হবে নারী আসলে কি এবং কেন।

তাহেরা আক্তার জলি
নারী এবং পুরুষ উভয়ে যদি গুরুত্বের জায়গাটা মূল্যায়ন করে, আমার মনে হয় মর্যাদাপূর্ণ সহ-অবস্থান তৈরিতে বেগ পেতে হয় না।

মো. ওবাইদুর রহমান
নারীর প্রতি সম্মান আপনা আপনি চলে আসে যদি আমরা মনে রাখি নারী ধারক, নারী বাহক, নারী জননী।

রেজাউর রহমান রিজভী
উচ্চ পর্যায়ে অনেক নারী কাজ করছেন, নারী বান্ধব নীতি নির্ধারণী হচ্ছে বাকীটা অর্জন করেতে হবে।

তারসিয়া আলম
নারীদের চাকরি করা না করা নিয়ে সমাজে অনেক কথা শোনা যায়। আমার চাকরি করার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না, চাকরিতে যোগ দেয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছে আমার হাজবেন্ড। নারীর এগিয়ে যাওয়ার পেছনে পুরুষের প্রেরণারও দরকার হয়। ইইউবিতে চাকরি করতে এসে দেখি এখানে নারী-পুরুষ সংখ্যার দিক দিয়ে সমান সমান এবং নারী হওয়ার কারণে কোনোরকম বেতন বৈষম্য নেই। এখানে কর্ম পরিবেশ নারীর জন্য পুরোপুরি নিরাপদ। যা আমার মানসিক স্বস্তির কারণ।

যারা অংশ নিলেন-

প্রফেসর ড. মকবুল আহমেদ খান
উপাচার্য, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

ড. ফারজানা আলম
ডাইরেক্টর, ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

শারিতা মিল্লাত
ডাইরেক্টর, এফবিসিসিই, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ভেরিতাস ফার্মাসিউটিক্যালস লি.

মাহজাবিন আহমেদ মিমি
রাজনীতি বিশ্লেষক, উদ্যোক্তা, লেখক ও সমাজকর্মী।

আলমগীর রেজা চৌধুরী
কবি ও সাংবাদিক।

রেজাউর রহমান রিজভী
লেখক ও সাংবাদিক।

শাপলা সপর্যিতা
লেখক ও শিক্ষক

রঞ্জনা বিশ্বাস
কবি ও গবেষক

তাহেরা আক্তার জলি
সিনিয়র শিক্ষক, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল।

কাজী রাফি
উপন্যাসিক, জিএম প্ল্যানিং অ্যান্ড অপারেশন) ফু ওয়াং ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লি:

বীরেন মুখার্জী
কবি ও সাংবাদিক

ফারজানা ছবি
অভিনেত্রী

মো. ওবাইদুর রহমান
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও চেয়ারম্যান কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইইউবি।

তারসিয়া আলম
সিনিয়র কো-অর্ডিনেশন অফিসার, ইইউবি।

সূচনা বক্তব্য
আ.ফ.ম গোলাম হোসেন, রেজিস্ট্রার, ইইউবি।

সঞ্চালনা
রাশিদা স্বরলিপি : পাবলিক রিলেশন্স অফিসার, ইইউবি।

করোনাকালে একটি দিনও আমরা নষ্ট করিনি: ইইউবি, উপাচার্য

‘মার্চ মাসের আট-দশ তারিখ থেকেই আমরা বুঝতে পারছিলাম পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। দেশ লকডাউন হতে আর দেরি নাই। তাই আমরা আগে থেকেই আমাদের শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। বিকল্প হিসেবে আমরা অনলাইন ক্লাস চালু রাখি। এর উপযুক্ত ফল শিক্ষার্থীরা পেয়ে। কথাগুলো বলছিলেন ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদের উপাচার্য মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. মকবুল আহমেদ খান।

তিনি বলেন, ‘দেশের বিশিষ্ট কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ এবং প্রফেসর আব্দুর রশীদ আমাদের তিনশো শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেন। অনলাইনে ক্লাস নেয়ার জন্য যা যা লাগবে সে বিষয়ে তারা বিস্তারিত বলেন। প্রথম প্রশিক্ষণের পরও কিছু সংশয় শিক্ষকদের মধ্যে ছিল। ১৮তারিখে একই বিষয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।’

ইইউবি উপাচার্য জানান, শিক্ষকদের জন্য প্রযুক্তিগত যা যা সাপোর্ট দরকার ছিলো পর্যাপ্ত যোগান দেয়া হয়েছে। প্রথমত শিক্ষকদের জন্য দুটি অপশন ছিলো, ক্লাসরুমে এসে ক্লাস নেয়া অথবা বাসায় থেকে ক্লাস নেয়া। প্রথম দিকে যাদের অনলাইনে পাঠদান করতে একটু সমস্যা হচ্ছিলো তারা ক্লাসরুমে এসে অন্য শিক্ষকদের সহায়তা নিয়েছেন। আনন্দের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন পরীক্ষায় ৯৫% শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। করোনাকালে এ ইইউবির শিক্ষার্থীদের জন্য টিউশন ফি-এর উপর পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দেয়া হয়েছে। এছাড়া ভর্তির ক্ষেত্রেও ছাড় দেয়া হয়েছে ৩০শতাংশ।

ড. মকবুল আহমেদ খান বলেন, ‘ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর টিউশন ফি এমনিতেই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে চার ভাগের এক ভাগ থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ। আমাদের নিজস্ব ক্যাম্পাস। এর ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য নানারকম সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা সহজ হয়েছে।’

তবে, পরীক্ষাগ্রহণের সময়কাল কিছুটা পিছিয়েছিলো। এর কারণ সম্পর্কে ইইউবির ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন-এর ডাইরেক্টর ড. ফারজানা আলম বলেন, ‘করোনার সময়ে আমরা আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট করেছি, যার ফলে কোন সেশনজট তৈরি হয়নি। আমরা মনে করি প্রতিটি মুহূর্ত শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য করোনাকালে যতোগুলো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যতোগুলো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে সবগুলো করা হয়েছে টাইম মেইনটেইন করার জন্য। সমস্যা আগে ভাগে বুঝতে পারার জন্য ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং অভিজ্ঞতা বলে একটা ব্যাপার থাকে।

আমাদের ভিসি স্যার, রেজিস্ট্রার স্যার এবং প্রোক্টর স্যার উনারা বীর মুক্তিযোদ্ধা, সমস্যা মোকাবিলা করার যথেষ্ট মানসিক শক্তিতো বটেই, সমস্যা আগেভাগে বুঝতে পারার দূরদর্শিতাও উনারা দেখিয়েছেন। উনারা একটা কথা সব সময় বলেন, সব কিছু ম্যানেজ করা যায় সময় কিন্তু কেনা যায় না। করোনা চলে যাবে, অনেক কিছুই হবে। সব কিছু কেনাগেলেও সময় কেনা সম্ভব না। এ করোনাকালে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে একটা সেমিস্টার চলে যাক

সেটা আমরা চাইনি। সময় নষ্ট করাটা আমাদের জন্য একটা লাক্সারি। আমরা যে ধরণের শিক্ষার্থীদের পড়াই তাদের জন্য, এমনকি বাংলাদেশের জন্যও।'

আইন, অধিকার, মানবাধিকার, বাস্তবতা এবং দেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা
ড. কাজী বজলুর রহমান

আইন কি?

আইনের একটি কার্যকরী এবং বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা হলো, আইন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত অথবা প্রচলিত এমন কিছু নিয়মকানুন যা একটি রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী নিজেদের উপর বাধ্যগত বা অবশ্য পালনীয় বলে স্বীকার করে। আইনকে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য কিছু নিয়ম-কানুনের সমষ্টি হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। একটি দেশের আইন ব্যবস্থা (Legal System) ঐ দেশের মানুষের মাঝে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য সহজ উপায় সরবরাহ করে। আইন হলো সেই মাধ্যম যা এই বিরোধ নিস্পত্তিতে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করে। আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলে উহাকে আইন বলা যায় না।

আইন ও রাজনীতির মাঝে সম্পর্ক

একদিক দিয়ে বিবেচনা করলে আইন এবং রাজনীতি এই দু'টি ধারণা বলতে গেলে 'মুরগী আগে না ডিম আগে' বিতর্কে জড়িত। কারণ প্রশ্ন হলো আইন ও রাজনীতি-এ দু'টির মাঝে কোনটি সমাজে আগে আসে। এক অর্থে রাজনীতিই আইনের জন্ম দেয়। কারণ, ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার বিভিন্ন সামাজিক দাবীগুলো সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার কারণেই জন্ম নেয়। পরবর্তীতে এই সব সামাজিক দাবীকে আইন হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য সমাজে আন্দোলনের জন্ম হয়। এই আন্দোলনই হলো রাজনীতি এবং এই রাজনীতি সরকারকে বাধ্য করে সামাজিক দাবীগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে আইন প্রণয়ন করতে।

অন্য একটি মতবাদের বিষয়বস্তু হলো যে, রাজনীতি আইন থেকে শুধু আলাদাই নয় বরং অনেকটা অধীনস্ত। কারন আইনের উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচার কিন্তু রাজনীতির উদ্দেশ্য বহুমুখী এবং প্রতিযোগীতামূলক। আইনগত বিধিবিধান এবং রাজনৈতিক বিধিবিধানের মাঝে পার্থক্য নিরূপনের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে গণ্য হবে। আইন ও রাজনীতি রাষ্ট্র ব্যবহার সম্মিলিত রূপ যার মধ্যে আইন একটি বিশেষ অবস্থানে থাকে।

আইন ও অধিকারের মাঝে সম্পর্কঃ

অধিকার হল সমাজে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দাবীকৃত এমন কতগুলো স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবী যার নৈতিক কিংবা আইনগত ভিত্তি আছে এবং যা মানুষের বিকাশের জন্য প্রয়োজন। এক অর্থে অধিকার আইনের সৃষ্ট নয়; ব্যক্তি এবং ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে অধিকার জন্ম লাভ করে। অধিকারকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করা যায়: নৈতিক অধিকার এবং আইনগত অধিকার। নৈতিক অধিকার হলো সেই সব অধিকার যা প্রাকৃতিক আইনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং যা ভঙ্গ করলে নৈতিক অপরাধ হয়। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকারই হলো আইনগত অধিকার যার ভিত্তি হলো দেশের কোন আইন এবং যা ভঙ্গ করলে আইনগত অপরাধ হয়। সুতরাং এক অর্থে সকল আইনগত অধিকারই নৈতিক অধিকার এবং আইনগত অধিকার এবং নৈতিক অধিকারের মাঝে পার্থক্য মাত্রাগত; বস্তুগত নয়।

আইন ও নৈতিকতার মাঝে সম্পর্কঃ

আইন এবং নৈতিকতা- এই উভয় ধারণাই সমাজে ব্যক্তির ব্যবহারিক আচরণকে নির্দেশ করে। বিধি হলো সমাজে মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত বিশেষ আচরণ। বিধি দু'ধরনের পতে পারে: (১) আইনগত বিধি (অন্য কথায় 'আইন'); এবং (২) নৈতিক বিধি (অন্য কথায় 'নৈতিকতা')। আইন হলো ঐ সকল বিধির সমষ্টি যা সমাজে মেনে চলা ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক এবং যা ভঙ্গ করলে নির্ধারিত শাস্তির বিধান রয়েছে। অন্যদিকে, নৈতিকতা হলো ঐ সকল বিধি-বিধান যা পালন না করলে বা ভঙ্গ করলে শাস্তির কোন বিধান নেই। নৈতিকতা সাধারণত ধর্মীয় চিন্তা চেতনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে এবং ইহা ভঙ্গ করলে নৈতিক অপরাধ বলে গণ্য হয় যার সাথে আইনগত অপরাধ এবং অপরাধের জন্য শাস্তির কোন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশে মিথ্যা কথা বলা সরাসরি কোন অপরাধ নয় যদিও নৈতিকতা বিরোধী।

ব্যক্তি জীবনে আইন ও অধিকারঃ

প্রতিটি ব্যক্তিই মানুষ হিসেবে কতিপয় অপরিহার্য, সার্বজনীন এবং অহস্তান্তরযোগ্য অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং এই অধিকারগুলোকে বলা হয় মানবাধিকার। মানবাধিকার আলোচনা করার পূর্বে অধিকার, মানবাধিকার, মৌলিক মানবাধিকার ইত্যাদি শব্দগুলোর সাথে আমাদের পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

অধিকারঃ

অধিকার বলতে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য কতিপয় সুযোগ-সুবিধার দাবীকে বোঝায়, যে দাবীর হয় নৈতিক না হয় আইনগত ভিত্তি রয়েছে। আইন অধিকারকে সৃষ্টি করে না; অধিকার সমাজে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে আপনা আপনি জন্মলাভ করে এবং আইন উক্ত অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় মাত্র। অধিকারকে ব্যাপক অর্থে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: নৈতিক অধিকার (Moral Rights); এবং আইনগত অধিকার (Legal Rights)। যে অধিকারের ভিত্তি নৈতিকতা (rule of natural justice) এবং যা ভঙ্গ করলে নৈতিক অপরাধ হয় তাকে নৈতিক অধিকার বলে। অন্যদিকে, যে অধিকার দেশের আইন (positive law) দ্বারা স্বীকৃত এবং যা আইনগত ভিত্তিতে দাবী করা যায় এবং ভঙ্গ করলে আইনগত অপরাধ হয় বা আইনের লঙ্ঘন হয় তাকে আইনগত অধিকার বলে।

মানবাধিকার:

মানবাধিকার বলতে মানুষের যে কোন অধিকারকে বোঝায় না; মানবাধিকার শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আইনগত ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেগুলোই মানবাধিকার যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে (as a human being) দাবী করতে পারে। এ অধিকারগুলো কোন দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়; এগুলো চিরন্তন এবং সার্বজনীন। অবশ্য মানবাধিকার শব্দটি আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়। কোন মানবাধিকারকে যখন দেশের সংবিধানে বা সংসদ কর্তৃক পাশকৃত আইনে স্বীকৃত দিয়ে বলবৎকরণের ব্যবস্থা করা হয় তখনই মানবাধিকার আইনগত অধিকারে রূপ নেয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) গ্রহণ করে। এই ঘোষণায় ২৫টি মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এগুলো মানবাধিকার বলে পরিচিত। ২৫টি মানবাধিকারের মধ্যে ১৯টি হলো পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার (Civil and Political Rights) এবং বাকী ৬টি হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার (Economic, Social and Cultural Rights)।

মৌলিক অধিকার:

যখন কতিপয় মানবাধিকারকে কোন দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সাংবিধানিক নিশ্চয়তা (Constitutional Guarantees) দ্বারা সংরক্ষণ করা হয় তখন তাদেরকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। কারণ হলো, যেহেতু সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন বা মৌলিক আইন এবং ঐ সংবিধানে সংযোজিত অধিকারগুলোও মৌলিক আইনের অংশ এবং এদেরকে বিশেষ সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় রক্ষা করা হয়; এদেরকে পরিবর্তন করতে হলে স্বয়ং সংবিধানকে সংশোধন করতে হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানে সুরক্ষিত মৌলিক অধিকারসমূহ:

বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৭ থেকে ৪৪ পর্যন্ত এই ১৮টি অধিকারের প্রকৃতি ও ভোগের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো সবই পৌর (Civil) ও রাজনৈতিক (Political) অধিকার। ১৮টি মৌলিক অধিকারকে প্রথম দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. রাষ্ট্রে অবস্থানরত নাগরিক ও বিদেশী উভয়ে ভোগ করতে পারে- এরূপ মৌলিক অধিকার ৬টি। এগুলো হলো:

১। জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার (অনুঃ ৩২)।
২। গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ (অনুঃ ৩৩)।
৩। জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ (অনুঃ ৩৪)।
৪। বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ (অনুঃ ৩৫)।
৫। ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুঃ ৪১)।
৬। সাংবিধানিক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার (অনুঃ ৪৪)।

খ. শুধুমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোগ করতে পারে- এরূপ মৌলিক অধিকার ১২টি। এগুলো হলো ২৭, ২৮, ২৯,৩০,৩১,৩৬,৩৭,৩৮,৩৯,৪০,৪২ এবং ৪৩ অনুচ্ছেদ বর্ণিত অধিকারসমূহ।

১৮টি মৌলিক অধিকার নিম্নরূপ:

(১) আইনের দৃষ্টিতে সমতা (অনুঃ ২৭)।
(২) ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য (অনুঃ ২৮)।
(৩) সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা (অনুঃ ২৯)।
(৪) বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ (অনুঃ ৩০)।
(৫) আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার (অনুঃ ৩১)।

(৬) জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ (অনুঃ ৩২)।
(৭) গ্রেফতার আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ (অনুঃ ৩৩)।
(৮) জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ (অনুঃ ৩৪)।
(৯) বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ (অনুঃ ৩৫)।
(১০) চলাফেরার স্বাধীনতা (অনুঃ ৩৬)।
(১১) সমাবেশের স্বাধীনতা (অনুঃ ৩৭)।
(১২) সংগঠনের স্বাধীনতা (অনুঃ ৩৮)।
(১৩) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা (অনুঃ ৩৯)।
(১৪) পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা (অনুঃ ৪০)।
(১৫) ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুঃ ৪১)।
(১৬) সম্পত্তির অধিকার (অনুঃ ৪২)।
(১৭) গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ (অনুঃ ৪৩)।
(১৮) মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের অধিকার (অনুঃ ৪৪)।

আমাদের সংবিধানে অরক্ষিত মৌলিক মানবাধিকারসমূহঃ

সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি হিসেবে নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে:

(১) মানবাধিকার (অনুঃ ১১)।
(২) কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি (অনুঃ ১৪)।
(৩) জীবনের মৌলিক প্রয়োজনসমূহের ব্যবস্থাকরণ (অনুঃ ১৫)।
(৪) গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব (অনুঃ ১৬)।
(৫) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা (অনুঃ ১৭)।
(৬) জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা (অনুঃ ১৮)।
(৭) সুযোগের সমতা (অনুঃ ১৯)।
(৮) কাজের অধিকার (অনুঃ ২০)।
(৯) সাংস্কৃতিক অধিকার, ইত্যাদি (অনুঃ ২৩)।

প্রচলিত আইনের উপর আস্থা না রাখলে পরিণতি কি হতে পারে?

আইনভঙ্গ করলে আমাদেরকে প্রধানত তিন ধরনের পরিণতি ভোগ করতে হবে:

(১) শাস্তি বা জরিমনা

বাংলাদেশে প্রচলিত শাস্তিমূলক আইন যেমন: দন্ডবিধি, বিশেষ ক্ষমতা আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, এসিড অপরাধ দমন আইন ইত্যাদি আইনের লঙ্ঘন করলে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতেহবে। যেমন: কারোর মৃত্যু ঘটানো হলে দন্ডবিধি অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড বা অন্য যে কোন দন্ড হতে পারে। কারোর উপর এসিড নিক্ষেপ করলে মৃত্যুদন্ডসহ অন্যান্য সাজা ও জরিমনা প্রদান করতে হবে।

(২) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃংখলা ভেঙ্গে পড়বেঃ

আমরা যদি নাগরিক দায়িত্ব হিসেবে আইন অমান্য করি তাহলে অন্যান্যরাও আইন অমান্য করবে। তাহলে সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি হবে। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে ব্যর্থ হবে।

(৩) মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারের নিশ্চয়তা পাবে নাঃ

আমি যদি প্রচলিত আইন-কানুনের উপর আস্থা না রাখি এবং নিজেই আইন ভঙ্গ করে অন্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করি কিংবা অন্য কাউকে মারধর করি বা অন্যের জমি দখল করি, তাহলে অন্যরাও আমার পথ অনুসরণ করবে। ফলে একটা অরাজকতা তৈরি হবে এবং এরূপ পর্যায়ে আদালতে বসতে পারবে না, সরকারী সংস্থাসমূহ সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না। ফলে নাগরিক অধিকার রক্ষায় আদালত বা সরকারী সংস্থাসমূহ কোন ভূমিকা রাখতে পারবে না।

আপনি কখন পারতপক্ষে আদালতে যাবেন না?

বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অনুসারে থানায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী মামলায় আসামী খালাস পেয়ে যায় এবং এই খালাসের মূল কারণ পুলিশ কর্তৃক তদন্তে ত্রুটি। পুলিশ কর্তৃক তদন্তে ত্রুটির পেছনে তিনটি বড় কারণ রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশে পুলিশের যথাযথ এবং যথার্থ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা নেই। দ্বিতীয়ত, সরকার এবং সরকারী সংস্থাগুলো পুলিশের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে তথা দলীয়ভাবে পুলিশকে ব্যবহার করায় পুলিশ নিরপেক্ষেভাবে মামলার তদন্ত করতে পারে না। তৃতীয়ত, পুলিশ মামলার কোন পক্ষ থেকে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়; অনেক সময় উভয় পক্ষ থেকেই ঘুষ গ্রহণ করে কিন্তু যে পক্ষ থেকে বেশী সুবিধা পায় সেই পক্ষের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ প্রস্তুত করে। এই তিন পরিস্থিতির যাতাকলে পড়ে দেশের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা প্রায় নাকাল এবং আস্থাহীন।

প্রবাদ আছে, মামলা হলো এমন একটি যন্ত্র যেখানে তুমি গরু সদৃশ পশু হয়ে ঢুকবে কিন্তু অবশেষে মাংসের কিমা হয়ে বেরোবে।"
আরও একটি চমৎকার প্রবাদ আছে, "ভেড়া ফিরে পাওয়ার জন্য মামলা লড়তে গিয়ে গরুটিই হারাতে হয়।"
বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই এসব প্রবাদ চলে এসেছে। আমাদের সমাজে বর্তমানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের জন্য আদালতে মামলা করতে যাওয়ার অর্থ হলো ভেড়া ফিরে পেতে গিয়ে গরু হারানো।
আমাদের অনেকের জীবনেই একটা সময় আসে যখন আমরা ভাবি, মনে মনে অনুভব করি, আক্রোশে ফেটে পড়ি- এই ভেবে যে, যে আইন আমাকে সুরক্ষা দেয় না সেই আইন মেনে আমার কি লাভ? সেই আইনের উপর আমার আস্থা রেখেই বা কি লাভ?

লেখক
ড. কাজী বজলুর রহমান
সাবেক আই.জি.পি
প্রক্টর, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

তথ্য নির্দেশঃ

(১) আইন ও অধিকার

মোঃ আব্দুল হালিম

(২) বাংলাদেশ আইন ব্যবস্থা
মোঃ আব্দুল হালিম

(৩) সাংবিধানিক আইন
এডভোকেট তফাজ্জল হোসেন

কম্পিউটিং আমাদের বিশ্বে বিপ্লব ঘটিয়েছে

কম্পিউটিং আমাদের বিশ্বে বিপ্লব ঘটিয়েছে যেহেতু আমরা এটি গত দুই দশকে জানি এবং একবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত প্রযুক্তির মূল হিসাবে কাজ করেছে। এই উদ্ভাবনের জন্য ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ বিশ্ব মানের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পেরে বিভাগের প্রধান হিসাবে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রধান হিসাবে আপনাদের আন্তরিক স্বাগত জানাতে চাই।

ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ স্নাতকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান এবং পেশাদার নৈতিকতার সাথে সজ্জিত করে যা ডিজিটাল বিপ্লবে নেতৃত্বের ভূমিকা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কারিগড় হিসাবে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ উচ্চশিক্ষার পাঠদান এবং একাডেমিক প্রোগ্রামগুলোকে কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, কৌশলগত ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষিত করা হয়ে থাকে। আমরা অধ্যয়ন ট্যুরগুলো আয়োজন করে থাকি, আমাদের শিক্ষার্থীরা স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক আইটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে তাদের সমর্থন করে শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞার বাইরে গুরুত্ব প্রদান করি। আইওটি, সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ এবং ইসিজি মনিটরিং সিস্টেম, এগ্রিকালচার, ফিশারিং এন্ড স্মার্ট হোম অটোমেশন প্রযুক্তির উপর গবেষণা প্রকল্পগুলোতে মনোনিবেশ করে। সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম (সিপিএস) এর মতো আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সংযোগের জন্য স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ সিস্টেমকে একটি শারীরিক সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা। ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ এর অন্যতম মূল প্রযুক্তি সিপিএস, জড়িততায় একটি শারীরিক সত্তার বিভিন্ন স্ট্যাটাসের সাথে যোগাযোগ করা, গণনা করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা। অতএব, ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ এর মূল লক্ষ্যগুলি হল আধুনিক প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার যেমন উদাহরণ। বাস্তব জীবনে বিদ্যমান জটিলতাগুলি সমাধানে করতে বা উন্নত করতে আইওটি, বিগ ডেটা, ব্লকচেইন, হ্যাডোপ ইত্যাদি।

আমাদের প্রধান লক্ষগুলো:

শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার বিজ্ঞানের মৌলিক নীতিগুলো এবং সমাজের জটিল সমস্যগুলি সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষিত করা।

কম্পিউটার বিজ্ঞান, এবং সফ্টওয়্যার এবং তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে এবং অগ্রগতিতে সামাজিক প্রয়োজনের জন্য উদ্ভাবনী, সৃজনশীল সমাধান সরবরাহে অবদান রাখতে সহায়তা করা।

রুপান্তরকামীভাবে সমাজকে প্রভাবিত করতে প্রকাশনা, পাবলিক সার্ভিস এবং পেশাদার ক্রিয়াকলাপগুলোর মাধ্যমে গবেষণা প্রচার করা।

মো: ওবায়দুর রহমান
সহযোগী অধ্যপক ও চেয়ারম্যান।
ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

Blue Economy: Prospects towards Sustainable Development

"The Blue Economy, the marriage of science, innovation and entrepreneurship creates a new business model that transforms society"

-Professor Dr. Gunter Pauli

The blue economy has opened up new horizons for the country's economy to take advantage of the vast body of water at sea and the vast resources at its bottom.The blue economy is a sea resource-dependent economy. One of the world's most valuable natural resources provides food through fisheries. The sea is also used as an efficient means of transportation. Also, the sea is used as a source of various natural mineral resources such as salt, sand, gravel, copper, cobalt, etc., and oil and gas resources. The sum of these elements is "*Sunil Economy*" or Blue Economy.

In 1994, Professor Dr. Gunter Pauli(Belgian economist) proposed the concept of the blue-economy as a sustainable and environmentally friendly model for outlining the future economy.

The maritime economy continues to contribute to the world economy in many ways. Three (3) to five (5) trillion US dollars' worth of activities are taking place around the sea every year. Marine fish, plants and animals provide 15 percent of the protein to the world's 4.3 billion people. Thirty percent of the world's gas and fuel oil is supplied from various gas and oil fields under the sea. It is also possible to develop a sea-based pharmaceutical industry by increasing knowledge of marine biodiversity.

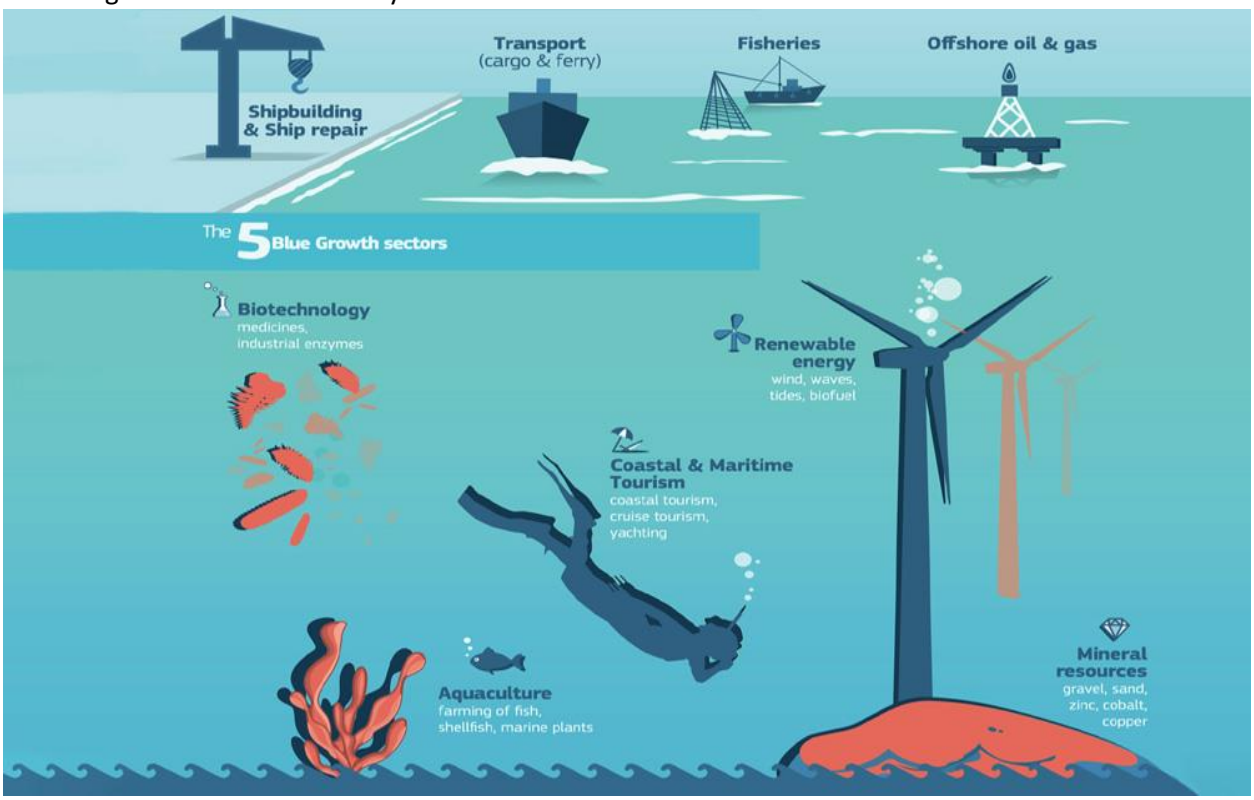

Fig.: Sectors Related to Blue Economy

The Blue Economy is becoming increasingly popular around the world. The Blue Economy has been at the center of discussions at all international conferences over the years. Besides, countries like Indonesia, Australia have already started taking the benefits from ocean resources.

Bangladesh's *Sunil Economy*Potential

The government has already identified 26 activities for the development of the maritime economy. These are: shipping, coastal shipping, seaports, ferry passenger services, inland water transport, shipbuilding, ship recycling industry, fisheries, marine aquatic products, marine biotechnology, oil and gas, sea salt production, ocean renewable Energy, Blue-Energy, Mineral Resources (Sand, Gravel and Others), Marine Genetic Resources, Coastal Tourism, Recreational Aquatic Sports, Yachting and Marines, Cruise Tourism, Coastal Protection, Artificial Islands, Green Coastal Belt or Delta Plan, Marine Security and Surveillance and Marine Aggregate Spatial Planning (MSP).In the formation of developed Bangladesh of 2041, an area of 1,18,613 m^2 with its proper use, the maritime economy can become a tram card.

- Bangladesh Delta Plan-2100 or Delta Plan-2100 has been adopted some time ago. Maritime economy has been given priority in this master plan. The plan adopts five strategies to harness the potential of the blue economy, one of which is the speedy completion of a multidimensional survey of marine resources. Through this, the government has taken up the first and foremost task to utilize the maritime economy.
- It is possible to earn about two and a half trillion US dollars every year by 2030 if activities are carried out in at least four cases in the territory which Bangladesh has got ownership as a result of sea conquest. The four areas are oil and gas extraction, fisheries extraction, port expansion and tourism.
- The World Bank has set up a 100 million fund for the Blue Program (PROBLUE) for sustainable maritime activities. The signing of which was done in November 2018. The World Bank also has the potential to invest in the maritime sector in Bangladesh.
- 145 crore people live on the shores of Bangladesh, India, Myanmar and Thailand on the shores of the Bay of Bengal. In the center of Bangladesh's position. As a result, there is a good opportunity to enrich the economy of Bangladesh due to the huge economic potential here.
- At present the trawlers of Bangladesh catch fish within 35-40 nautical miles from the coast. But our economic zone is 200 nautical miles. There is a special opportunity to strengthen the country's economy in the maritime economy by working in a wider range.
- According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Bangladesh is the first of the four countries in the world to achieve huge success in fish farming by 2022. Then Thailand, India and China. With the acquisition of new waters, Bangladesh has the potential to expand its blue economy. So, it is time to take this opportunity in the sea sector.
- Bangladesh is a member of the Indian Ocean Rim Association (IORA), an organization of 21 member countries of the Indian Ocean region. Different countries of this alliance are working on blue economy.
- According to the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), 80 per cent of Bangladesh's trade and commerce comes from sea fishing, seafood and commercial sea transport. About 30 million people are directly and indirectly involved in these activities. Of these, 5 million people are engaged in marine fish harvesting alone. If this sector is modernized, it is only a matter of time before this number increases.
- Clay, the raw material of the cement industry, has been found at a depth of about 30 to 60 meters in the Bay of Bengal. Extraction of shallow sea clay will revolutionize the cement industry in Bangladesh. Precious uranium and thorium have also been found in the ocean floor. It is easy to guess what the demand for these two metals is in the world.
- If 4 percent growth can be achieved from a sea dependent economy, then it will be easier to fulfill Vision 2041. As a result, we will reach a developed country in this period.

Sea resources offer a new window of opportunity for Bangladesh. Increasing knowledge of the seas including the impact of wind, waves, high tide and ebb tide, change of temperature of the living organisms, and increase of salinity on the surface of seas could lead to sources of renewable energy. Every year, the use of wind from the seas is increasing by 40 percent and Bangladesh could use wind power for various purposes to strengthen its economy.

Md. Saidur Rahman
Lecturer
Department of Electrical and Electronics Engineering
European University of Bangladesh

Become a Dreamer

Dr. Md. Hazrat Ali

Desire a dream!
Think a dream!!
And look a dream!!!

Always look a big dream.
To be a successful man
Prepare a dream what you can.
To be a successful father,
Build your son not as like other.
To be a successful mother,
As like you, grow up your daughter.
To be a successful brother,
Don't make yourself just like a feeder.
To be a famous and the best teacher,
Take to you students' minds and ears.
To be a successful leader,
Acquire faith of social header.
To be a prime minister
Pay hundred percent love to young star.
Catch the proper and suitable dream
Shape the live and achievable dream.
Where the journey be dream able,
European University is a place for trustable.

১৫ আগস্ট: নেতা বঙ্গবন্ধু ও শাসক শেখ মুজিব

মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালেক মিয়া

১৫ আগস্ট। ১৯৭৫ সালের সোবেহ সাদেক। ৫ টা ৪০ মিনিট। স্বাধীন বাংলাদেশের ঘাতকের বুলেটে নিহত হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু। তাই আমার লেখার প্রারম্ভেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের কালো রাতের নিহত সকল শহীদদের। সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের সকলের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিচ্ছিন্ন দুটি নাম, দুটি সত্ত্বা। বাংলাদেশের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হলে বঙ্গবন্ধুকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর ত্যাগী সংগ্রামী গোটা জীবনের ফসল হচ্ছে বাংলাদেশ। একজন মানুষের যেমন ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বা থাকতে পারে তেমনি বঙ্গবন্ধুরও দ্বিবিধ সত্ত্বা যেকোন বাঙালির চোখে দেদীপ্যমান হয়ে উঠতে পারে। এর একটি হচ্ছে নেতা বঙ্গবন্ধু এবং অন্যটি হচ্ছে শাসক বঙ্গবন্ধু। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবি সত্ত্বাই হচ্ছে তাদের সাহিত্য প্রতিভার হিরন্ময় দিক। এ কবি সত্ত্বাকে অবলম্বন করেই বেড়ে উঠেছে তাদের কথা সাহিত্য বা সংগীত-শিল্প প্রতিভা। সেখানে অন্যান্য অঙ্গনের বিচরণ প্রতিভা তাদের কবি সত্ত্বাকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না। ঠিক তেমনি নেতা বঙ্গবন্ধু এবং শাসক শেখ মুজিবকে যদি ভিন্ন সত্ত্বায় বিশ্লেষণ করি তবে নেতা বঙ্গবন্ধু শাসক শেখ মুজিবকে অতিক্রম করে অনেকে উর্ধ্বে তার স্থান করে নিবে।

বঙ্গবন্ধু তার ৫৫ বছর বয়সের দীর্ঘ ৩৩ বছর কেটেছে রাজপথের রাজনীতিতে। আর মাত্র সাড়ে ৩ বছর কেটেছে ক্ষমতার রাজনীতি। আর এই ৩৩ বছর রাজনৈতিক জীবনে তার সাড়ে ১৭ বছর বিভিন্ন সময়ে কেটেছে কারান্তরালে। কাজেই বঙ্গবন্ধু নেতা সত্ত্বাকে কখনই সাড়ে ৩ বছরের শাসক সত্ত্বার সাথে একই নিরিখে বিচার করে দেখা যায় না। কারণ নেতা বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক জীবনে বাংলাদেশ সৃষ্টির একটি আকাশ ছোঁয়া সাফল্যের ইতিহাস রচনা করে গেছেন। এ ইতিহাসে অনুগামী হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ৫২-র ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, ৬২-র আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৬৬-র ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচনে বিপুল বিজয়, ৭১ এর ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ নিরস্ত্র জাতিকে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হতে সশস্ত্র জাতিতে পরিণত করা এবং দেশের সর্ব বৃহৎ দল আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকার কথা। যদিও ৭১ এর ৭ মার্চ এর ভাষণ আজ আর শুধু বাঙালির প্রেরণার উৎস নয়। এটা এখন বিশ্বের সকল স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গত ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে নানা পর্যায়ে কয়েক দফা বৈঠক করে গত ২৯ অক্টোবর ২০১৭ ইউনেস্কোর মেমোরী অব দ্যা ওয়াল্ড এর পরামর্শক সভা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের উক্ত ভাষণটি বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্যতম দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো মর্মে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকাভা ঘোষণা দেন। ফলে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের উক্ত ভাষণটি আজ বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যতম সম্পদে পরিণত হয়েছে। এ বিশাল বিপুল সাফল্যের কাছে শাসক শেখ মুজিব গৌণ হতে বাধ্য। জনগণ যে বঙ্গবন্ধুর কাছে একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছে, সেই বঙ্গবন্ধুর কাছে আরও অরেক প্রত্যাশা করেছে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত, অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত দেশটির সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কেউই বিচার করে দেখতে চায়নি। তবু বঙ্গবন্ধু সাড়ে ৩ বছরের শাসন আমলে যা করেছেন তার মূল্যায়ন তার বিরুদ্ধবাদীরা কখনও করে দেখেনি। বরং অপপ্রচার আর বিভ্রান্তির চোরাবালিতে তার অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। তাতেও সফলকাম না হয়ে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র আর হত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

যে পরিস্থিতিতে এবং প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন, মহাপরাক্রমশালী পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে জয় করার চেষ্টা মোটেও দুরূহ ছিল না। কারণ স্বাধীনতার পর যে দেশ জনগণ পেয়েছিল তা দীর্ঘ ২৪ বৎসরের শোষণে জর্জরিত, ৯ মাসের যুদ্ধে সারা দেশের ব্রীজ, রাস্তা ধ্বংসের কারণে যোগাযোগ ব্যাবস্থা ছিল বিপর্যস্ত, উৎপাদনশীল বহু কল-কারখানা ছিল অকেজো, সামুদ্রিক বন্দর ছিল ব্যবহারের অযোগ্য, বৈদেশিক মুদ্রা ভান্ডার ও স্বর্ণের রিজার্ভ ছিল শূণ্যের কোঠায়, একেতো যুদ্ধের কারণে চাষাবাদে কৃষকের অনাগ্রহ, অপরদিকে প্রবল বন্যায় ফসল হানি। ফলে খাদ্য গুদাম ছিল খালি ৬৫ লক্ষ ঘরবাড়ি ছিল ভস্মীভূত। এক কোটি লোক ছিল উদ্বাস্তু, তিন কোটি লোক ছিল ছিন্নমূল। ২/১ টি দেশ ছাড়া তখনও পৃথিবীর অধিকংশ দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবৈধ অস্ত্র, দক্ষ লোকের অভাবে প্রশাসন যন্ত্র বিকল, পঙ্গুত্বের পথে ছিল জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা। এরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশটিকে

মাথা তুলে দাঁড় করাতে গিয়ে বঙ্গবন্ধকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের এদেশীয় এজেন্টরা ধ্বংসাত্মক ও মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এইসব অপশক্তি পাটের গুদামে দিয়েছে আগুন, সারের কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, ৫ জন পার্লামেন্ট ও ২ জন গণ পরিষদের সদস্য সহ বহু নেতা কর্মীকে হত্যা করেছে, নগদ টাকায় কোন খাদ্য যথা সময়ে দেশে পৌঁছাতে না দিয়ে দেশে কৃত্রিম খাদ্য সংকট তৈরি করেছে। ফলে শুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষ। জরুরি ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষাবস্থা মোকাবেলা করার জন্য পাঁচ হাজার সাত শত লঙ্গরখানা খোলা সত্ত্বে ও ২৭ হাজার লোক অনাহারে মারা গেছে। কিন্তু এ সংখ্যাকে বহু ফুলিয়ে ফাপিয়ে প্রচার করে এক ধরনের পত্রিকা জনগণকে বঙ্গবন্ধুর বিপক্ষে দাঁড় করানোর চেষ্টা চালিয়েছে। মূক-বধির বাসন্তিকে ছেঁড়া জাল পরিয়ে ছবি তুলে প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু ঐ ষড়যন্ত্রকারীরা কি জানতো না স্বাধীনতার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা চীনেও দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করেছিল। জানতো ঠিকই, কিন্তু জনগণকে তা জানতে দেয়া হয়নি।
কিন্তু ঐ জনগণ কি একটিবারও ভেবে দেখেছে ৫০-এর দশকে পূর্ব বাংলার দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা ও ভূখা মিছিলের নেতা ছিলেন শেখ মুজিব, সেই তিনি কি জনগণের ভাগ্য বিধাতা হিসেবে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় কম প্রচেষ্টা চালাবেন? মাত্র সাড়ে তিন বছর বঙ্গবন্ধুর শাসনকাল। এ শাসনকালে তো আরাম আয়েসে কোন মুহূর্ত কাটাননি, বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়ার চেষ্টা করেননি। তিনি ১৪০ টি দেশের স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন, জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন করেছিলেন, আরব বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে এ শর্তে তিনি ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে প্রত্যক্ষ সহায়তাকারী দেশ ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে মাত্র তিন মাসের মধ্যে এ দেশের মাটি হতে ভারতীয় সৈন্য ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনী পুনর্গঠন করেছিলেন, সারা দেশের রাস্তা-ব্রীজ মেরামত করে যাতায়াত ব্যবস্থা সচল করেছিলেন, কৃষি-শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সর্বোপরি নজিরবিহীন ভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক বছরের মধ্যেই তিনি আধুনিক সমাজের উপযোগী একটা সংবিধান জাতিকে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মোটকথা আকাশসম সমস্যা মাথায় নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে মাত্র সাড়ে তিন বছরে তা কমিয়ে পাহাড়সম স্থানে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।
বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ তথা বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, তাকে নিন্দুকেরা দুঃখজনকভাবে একদলীয় শাসন হিসেবে চিহ্নিত করে। অথচ এ ক্ষেত্রেও জনগণ নিজেদের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে একটিবারও চিন্তা করে দেখেনি, যে বঙ্গবন্ধু আইয়ুব স্বৈরশাসন ও একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর আন্দোলন করেছেন, জেল খেটেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন, সেই বঙ্গবন্ধু কি তার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ ঐ একদলীয় শাসনের জন্ম দিতে পারেন? বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন, দেশের বাস্তবতা বিবেচনায় এটা আমার সম্পূর্ণ সাময়িক ব্যবস্থা।
অথচ ৬৬-তে ৬-দফা ঘোষণা করা হলে যে গোটা জাতি বঙ্গবন্ধুর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন, ৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব শাহের পতন ঘটিয়ে যে বঙ্গবন্ধুকে জনগণ মিথ্যা ষড়যন্ত্রের দায় থেকে রেহায় দিয়ে জেল থেকে মুক্ত করে এনেছিল, ৭০-এর নির্বাচনে যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ৯৮ ভাগ জনগণ তাদের রায় ব্যক্ত করেছিল, সেই বঙ্গবন্ধু তার প্রিয় দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য কি করেন তা দেখার জন্য তাকে পর্যন্ত সময় দিতে আমরা কুণ্ঠিত হয়ে উঠি। এখানেই হয়তো শাসক মুজিবের দুর্ভাগ্য। তবে একটা কথা সত্য শাসক শেখ মুজিব মূলত নেতা বঙ্গবন্ধুরই ফসল। কারণ বঙ্গবন্ধু একটা স্বাধীন দেশের জন্ম না দিলে আমরা শাসক মুজিবের দেখা পেতাম না ।
তাই শাসকের পরিচয়ে কিংবা একটি দলের গণ্ডিতে তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখার কোন যুক্তি নেই। সময়-কালের অনেক ঊর্ধ্বে বঙ্গবন্ধুর স্থান, দল-ব্যক্তি সত্ত্বার অনেক ঊর্ধ্বে তার অবস্থান। তাই বঙ্গবন্ধু কোন পরিচয়ে নয়, বঙ্গবন্ধু কোন নির্দিষ্ট দলের নয়, বঙ্গবন্ধু গোটা দেশের, গোটা জাতির এবং বর্তমান গোটা বিশ্বের স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী সম্প্রদায়ের সম্পদ। এ দেশ যদি বঙ্গবন্ধু প্রেরণা হয়, তবে এ দেশের ১৬ কোটি লোক বঙ্গবন্ধু চেতনা। সেই চেতনাকে যেদিন ধ্বংস করা হয়েছে, সে মহামানবকে যে দিন আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে সে দিনটি আমাদের জন্যে সবচেয়ে বেদনার দিন, সবচেয়ে শোকের দিন। শতাব্দীর যে মহানায়ককে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছিলাম, আগামী সহস্র শতাব্দীতেও তাকে হারানোর শোক কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে কিনা তা বলা দুষ্কর।
একজন মুক্তিযোদ্ধার দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কোনদিন কারো কাছে মাথা নত করেননি। মাঝে মাঝে মনে হয় জাতীয় কবির চির উন্নত মম শির' কথাগুলো যেন তাকে সামনে রেখেই লেখা হয়েছিল। বাঙালির স্বাধিকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। বাঙলিকে দিলেন গর্ব। দিলেন জাতীয়তাবাদ। দিলেন মাথা উঁচু করে হাঁটার সাহস। যে গর্ব, যে সাহস বাঙালিরা হারিয়েছিল পলাশীর আম্রকাননে প্রায় আড়াই শত বছর আগে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার হত্যার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ড একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যেমন ১৭৫৭ সালে সিরাজ হত্যাও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। সিরাজ হত্যার পর বাংলার ইতিহাস আমাদের জানা আছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরও যেন অনেকটা এক ও অভিন্ন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল। দুজনই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য। বাংলার জনগণের স্বাধীকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আবালবৃদ্ধবণিতার গর্ব উদ্দীপ্ত মুখ-এটা স্বাধীনতার বিরোধী দল ও তাদের বিদেশী প্রভুরা বাদ বাধলো। ঘাতকের খড়গ নেমে এলো। হলো ইতিহাসের আর এক অধ্যায়ের যবনিকাপাত।
পাকিস্তানের কারাগারে অভ্যন্তরীণ মুজিবের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। একাত্তরের আগস্টে তার গোপন বিচারের ঘোষণা এলে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ প্রবলতর হয়। জাতিসংঘের উপসংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট এর পক্ষে সেক্রেটারী জেনারেল ম্যাকডারমট ইয়াহিয়ার কাছে প্রেরিত তারবার্তায় বলেছিলেন আইন প্রয়োগে গোপনীয়তার কোন স্থান নেই। যে মানুষটির জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, সেই মানুষটির জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারেনি তার নিজের দেশ, বাংলাদেশ। আমার মনে পড়ে, ১৯৪৭ সালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন আপনার যোগ্যতা কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি দেশবাসীকে অত্যন্ত ভালবাসি। পরবর্তী পর্যায়ে ঐ একই সাংবাদিক পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনার অদক্ষতা কি? বঙ্গবন্ধু শান্ত সুরে উত্তর দিলেন, আমি জনগণকে অ...নে...ক ভালবাসি। আবার এক জন্মদিনে বিদেশী কিছু সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে শুভেচ্ছা জানালে গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে তিনি বলেন, আমার জন্মদিনই কি, মৃত্যু দিবসই বা কি? আমার জীবনই বা কি? মৃত্যুদিন আর জন্মদিবস অতি গৌণভাবে এখানে অতিবাহিত হয়। আমার জনগণই আমার জীবন এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম ছিল প্রশ্নাতীত।
জমাট বাঁধা বেদনার পর একটু স্বস্তি অনুভব করি এই ভেবে যে, অবশেষে বিচারক আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে জনক হত্যার বিচারে খুনিদের ফাঁসি হয়েছে। দণ্ড কিছু কার্যকর হয়েছে। বাকী খুনিরা বিভিন্ন দেশে পালিয়ে আছে। অবিলম্বে তাদের ফিরিয়ে এনে দণ্ড কার্যকর করা হোক। এটাই এখন সময়ের দাবি। পরিশেষে প্রখ্যাত সাহিত্যিক কবি অন্নদাশংকর রায়ের সেই বিখ্যাত ছন্দের উদ্ধৃতি করেই আমার এই বেদনার লেখাটুকু শেষ করলাম-

"যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান"

বিজয়ের জারি
মুহম্মদ নূরুল হুদা

বাংলা আমার মায়ের ভাষা, বাংলা মায়ের দেশ
বাংলা আমার বাউলা পিতার ব্যাকুল নিরুদ্দেশ।
এই দেশেরই পলিজলে হাজার নদীর ধারায়
মুক্তদেশের মুক্তমানুষ পালের নৌকায় যায়।
সেই নৌকার মোহন মাঝি জাতির জনক শেখ,
জাতিপুত্র জাতিকন্যা, দেখ রে সবাই দেখ।

চূড়ান্ত ডাক সাতই মার্চে দিলেন মুজিবর,
বিজয় এলো একাত্তরের ষোলো ডিসেম্বর।
সেদিন থেকে বীরবাঙালির মুক্ত সকল ঘর
স্বাধীন দেশে সবাই স্বাধীন, কেউ কারো নয় পর।
অনাদিকাল সেই বিজয়ের চলেছে প্রস্তুতি,
অনন্তকাল সেই বিজয়ের বাড়বে শুধু দ্যুতি।

জন্মশতবর্ষে এসে চিরজন্মে লীন
স্বাধীন জাতির স্বাধীন পিতা, জাতি শঙ্কাহীন।
তর্জনী তাঁর ন্যায়ের দণ্ড, বীরের স্বাধীনতা;
মানুষ মাত্রে জন্ম-স্বাধীন, প্রাণের মর্মকথা।
ব্যক্তি, জাতি, জাতীয়তা, গণতন্ত্র, সাম্য,
সম্প্রীতি আর ন্যায়ের নীতি সংবিধানে কাম্য।

বঙ্গমাতা দিলেন তুলে স্নেহ-সুধা দুগ্ধ,
মানুষপাখির মনোডানায় উড়ছে মানুষ মুগ্ধ।
বছর যাবে যুগও যাবে যাবে কত শতক
থাকবে সুখে বঙ্গবাসী, জননী ও জনক।
মুক্ত বিশ্বে মুক্ত বাংলা, জয় বাংলার জয়
বাঙালি আজ বিশ্বমানুষ নিশঙ্ক-নির্ভয়

নিশঙ্ক-নির্ভয় নিশঙ্ক-নির্ভয় নিশঙ্ক-নির্ভয়।
০৪-০৫.১২.২০২০

Power System Master Plan-2016: Private Sector Investment in Power Generation of Bangladesh

The Power System Master Plan (PSMP) 2016, sponsored by Japan International Cooperation Agency (JICA), aims at assisting the Bangladesh in formulating an extensive energy and power development plan up to the year 2041, covering energy balance, power balance, and tariff strategies. Bangladesh has an aspiration to become a high-income country by 2041. The development of energy and power infrastructure therefore pursues not only the quantity but also the quality to realize the long-term economic development. Since Bangladesh is facing to the depletion of domestic gas supply, various issues such as sustainable development harmonizing with economic optimization, improvement of power quality for the forthcoming high-tech industries, and the discipline of operation and maintenance (O&M) for power plants need to be addressed holistically. Furthermore, energy subsidy is also a tough challenge, because there's always a concern that drastic increase of fuel and electricity prices may trigger another negative effect on the national economy. A meticulous analysis is required to find the best pathway to attain the sustainability of the energy and power sectors in balancing with the economic growth. The new PSMP study covers all the aforementioned challenges comprehensively, and come up with feasible proposals and action plans for Bangladesh to implement.

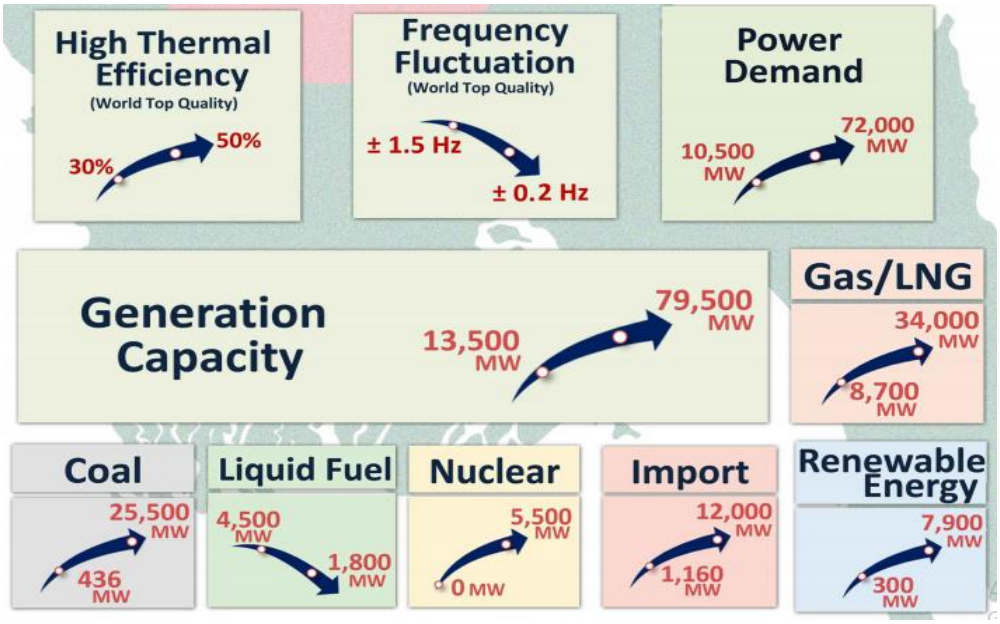

Vision 2041: Power System Master Plan-2016

Sector-wise Generation Capacity in Bangladesh

At present, in Bangladesh, there is no limiting line for the share of generation capacity by private sector. In 2017, the share of generation capacity in the private sector is approximately 50%, which tends to increase in a manner which may cross 50% in forthcoming years. Government may adopt essential measures to set a demarcation line for the public and private share of total generation capacity. The capacity share of public sector should be more than private sector to ensure the energy security of the country. The generation capacity share of public and private sector is shown in below.

BANGLADESH

Sector	Generation Capacity (MW)	Share
Public	6,167	50.2%
Private (IPPs)	6,115	49.8%
Total	**12,282**	-

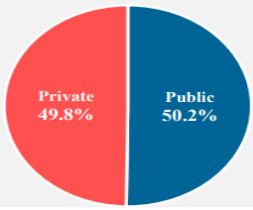

Source: Revisiting PSMP2016

The observations regarding public and private share of generation capacity of some neighboring countries are as follows:

Sector-wise Generation Capacity in Thailand

The largest state-owned entity in the power sector is Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). EGAT is the key power generator and the sole operator of the national transmission network while the latter two are responsible for the distribution in provincial areas, and metropolitan areas and vicinity, respectively. Thailand has adopted the Enhanced Single Buyer (ESB) structure. The private sector participation has been allowed in Thailand since early 1990s when the government privatized the power generation business. The government liberalized the sector by introducing open bidding for power projects in 1994 under the Independent Power Producer (IPP) scheme to reduce EGAT's investment burden in building power plants to revitalize the fast growth. In addition to IPP, smaller-scale private-owned power plants operate under Small Power Producer or SPP (mostly 90 MW contracted capacity) and Very Small Power Producer (VSPP).

THAILAND

Sector	Generation Capacity (MW)	Share
Public (EGAT)	16,385	32.7%
Private	33,684	67.3%
Total Installed	**50,069**	-

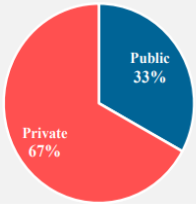

Sector-wise Generation Capacity in India

Indian power sector has 330.86 GW installed capacity with more than half i.e., 55.5% under State Electricity Boards, which is followed by Public Sector Unit's like NTPC, NHPC, and NPCIL etc. Over 55% of installed generation capacity in Sri Lanka is carried out by the public sector; rest is being carried out by the private sector.

	Sector	Generation Capacity (MW)	Share
INDIA	Public (Central & State)	1,83,725	55.5%
	Private (IPPs)	1,47,125	44.5%
	Total	**3,30,860**	-

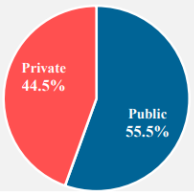

Shared Capacity of Public and Private Sector in Bangladesh

As per high case study, total generation capacity from public, private, import and candidate power plants will be 94,160 MW in 2041. Out of this capacity, public sector 61,882 MW (66%), private sector 4207 MW (4%), imported power 14,121 MW (15%) in 2041. In the long-term plan, the ownership of the candidate plants will not be possible to identify. So, the ownership of the total 13,950 MW capacity of the candidate plants will not be identified in this analysis. The sharing capacity of public and private sector up-to 2041 is shown in Tables

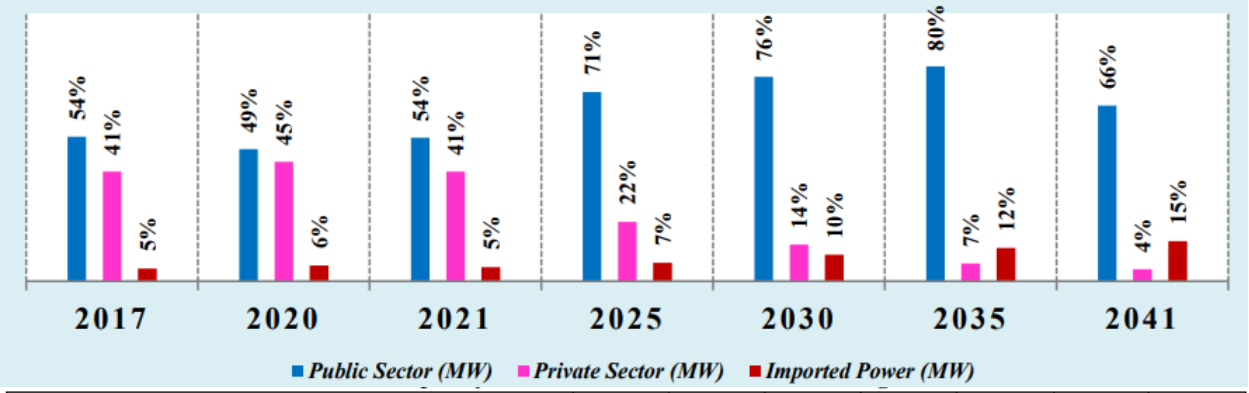

Year	2017	2020	2021	2025	2030	2035	2041
Total net generation capacity of public sector (MW)	7,451	12,752	15,253	30,563	47,270	59,071	61,882
Total net generation capacity of private sector (MW)	5,662	11,540	11,637	9,589	8,451	4,853	4,207
Total net generation capacity from imported power (MW)	660	1,500	1,500	2,996	6,121	9,121	14,121
Total net generation capacity from Candidate power plants (MW), Ownership not known	0	0	0	0	0	400	13,950
Grand total net generation capacity (MW)	13,773	25,792	28,390	43,148	61,842	73,445	94,160
Year	**2017**	**2020**	**2021**	**2025**	**2030**	**2035**	**2041**
Public Sector (MW)	54	49	54	71	76	80	66
Private Sector (MW)	41	45	41	22	14	7	4
Imported Power (MW)	5	6	5	7	10	12	15
Total net generation capacity from Candidate power plants (MW), Ownership not known	0	0	0	0	0	1	15
Grand total net generation capacity (MW)	100	100	100	100	100	100	100

Source: Revisiting PSMP2016

A striking characteristic of private investment in electricity sector of the country has been the concentration of investments and projects in generation compared with transmission and distribution. So, transmission and distribution systems are still far behind in comparison to power generation. If similar situation continues for a long period, it will be difficult to get full benefit of increased generation. However, private investment is required in developing transmission and distribution systems parallels with generation. In fact, transmission capacity must be at least 50% higher than actual generation capacity. Similarly, distribution capacity should not be less than 100%higher than generation capacity.

In power generation, there should be fair competition in public and private projects; so that, country and its people could get maximum benefit of less costly power as a derivative of fair competition. According to Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh 1996, private entrepreneurs get Income Tax, VAT, any other surcharges and other benefits; which is not applicable for public sector agencies. Moreover, some IPPs have been permitted to import liquid fuel with some special condition, which is undoubtedly favorable to profitability of their projects. However, public sector power plants don't enjoy such facilities. As per Public Procurement Act (PPA) 2006, public sector power plants are procured considering quality and cost-based tariff. It could be resulted to inefficiency in selecting EPC contractor and high implementation cost. So, in case of public sector power plants, tariff-based PPA should be introduced for bringing transparency and ensure fair competition with private plants.

References:
http://www.ceb.lk/publications;
UNDP-LECB-Assessment-Sri-Lanka-Power-Sector
Malaysia Energy Information Hub; http://meih.st.gov.my/statistics Asian Insights Spar, T
hailand Power Industry, Published on 26th Apr 2017
http://www.cea.nic.in/monthlyinstalledcapacity.html
Probate Sector Power Generation Policy in Bangladesh
Public Procurement Act (PPA) 2006
https://powerdivision.portal.gov.bd/ Power System Master Plan-2016

Md. Shiful Islam
Lecturer and Faculty Coordinator
Department of Electrical and Electronics Engineering
European University of Bangladesh